ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

# ইসলামি পাটিগণিত
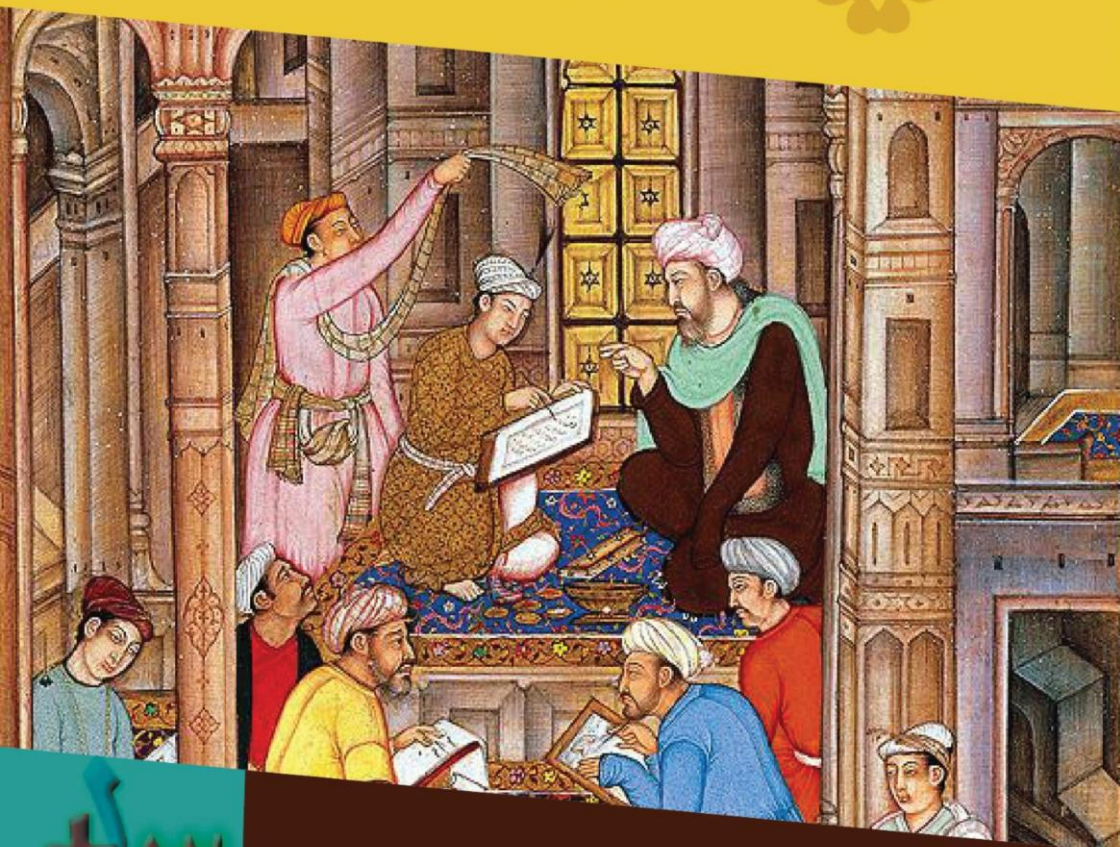
আবুল কাশেম

# ইসলামি পাটিগণিত

আবুল কাশেম

একটি ধর্মকারী ইবুক
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
dhormockery@gmail.com

# ইসলামি পাটিগণিত

আবুল কাশেম

**প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৬**



**ধর্মকারী ইবুক**

ধর্মকারী
dhormockery

***প্রকাশক***

**ধর্মকারী**

ঢাকা,
বাংলাদেশ।

**প্রচ্ছদ**

**কবি**

**ইবুক তৈরি**

**নরসুন্দর মানুষ**

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

---

**Islami Patigonit, by Abul Kashem**
Frist Edition: November 2016
**Published by: Dhormockery eBook**
Dhaka, Bangladesh.
**eBook by: NoroSundor Manush**

# সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

# সূচনা

ইসলামী পণ্ডিতেরা এবং ইসলামী ঐতিহাসিকেরা সর্বদাই প্রচার করে চলেছেন যে, বিশ্বকে অঙ্কশাস্ত্র বিশেষত বীজগণিত উপহার দিয়েছে ইসলাম। ভাব-সাব এমন, যেন ইসলামের পূর্বে বিশ্বে অঙ্কশাস্ত্রের প্রচলন ছিল না। কিন্তু সত্য হল, সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষত আধুনিক দশমিক সংখ্যা তথ্যের উদ্ভব করেছে হিন্দুরা–ভারতবর্ষেই। পরে আরবেরা এই সংখ্যা-তথ্য (নাকি "তত্ত্ব" হবে?) অবলম্বন করে এবং ধীরে ধীরে তা বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ইবুকটিতে আমরা দেখব, ইসলামের উৎস, তথা কোরান এবং হাদিসগুলোতে কীভাবে পাটিগণিতের ব্যবহার করা হয়েছে।

**আবুল কাশেম**

মে, ২০১৩

# আল্লাহ্‌র পরিসংখ্যান তথ্য

আমরা প্রথমেই দেখি কোরানে আল্লাহ্‌ তা’আলা লিখেছেন যে, তিনি পাটিগণিত জানেন। সূরা মারইয়ামে আল্লাহ্‌ লিখেছেন:

১৯:৯৪ তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী’ (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌ তা’লার কাছে বিশ্বের সবকিছুর হিসাব রয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি, এই হিসাবের জন্য পাটিগণিতের মৌলিক বিধান—যথা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তা’আলা খুব ভালোভাবেই জানেন। আরও ধরে নিতে পারি যে, আল্লাহ্‌র কাছে যে-পরিসংখ্যান আছে, তা নির্ভুল এবং সাম্প্রতিক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক অনুমানের ওপর হিসাব রাখেন না।

আয়াত **১৯.৯৪**-এর প্রসঙ্গ হচ্ছে: আল্লাহ্‌ জানলেন যে, খ্রিষ্টানেরা নাকি বলেছে যে, আল্লাহ্‌র এক সন্তান আছে। এই ব্যাপার জেনে আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন, এবং দাবি করলেন যে, তিনি সবকিছুই গণনা করে সব কিছুর তথ্য ও হিসাব জানেন। এই প্রসঙ্গে ইব্‌নে কাসীর লিখেছেন:

সবারই গণনা তাঁর কাছে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সবকে পরিবেষ্টন করে আছে। সবাই তাঁর ক্ষমতা আওতার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় এবং ভাল ও মন্দের খবর তিনি রাখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে। **(তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২০৩)।**

সূরা আস-সাফ্‌ফাতে হযরত ইউনুস প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক লিখেছেন:

৩৭:১৪৭ এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। ৩৭:১৪৮ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী’ (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌ তা’লা তাঁর পরিসংখ্যান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। আল্লাহ্‌ হযরত ইউনুসকে মাছের পেটের থেকে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মসুলের কাছে নিনেভার জনতার মাঝে। কিন্তু তখন নিনেভার জনসংখ্যা কত ছিল, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য রাখেননি। এই সমস্যা এড়াবার জন্য কোরানের ব্যাখ্যাকারীরা নানা আবোল তাবোল লিখেছেন; যেমন ইব্‌নে কাসীর লিখেছেন:

তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বা এর চেয়েও কিছু বেশী বা সত্তর হাজারের বেশী অথবা এক লক্ষ দশ হাজার। একটি মারফূ’ হাদিসের বর্ণনা হিসেবে তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। **(তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, ষষ্টদশ খণ্ড, পৃঃ ২৩০)।**

এদিকে পরিসংখ্যানে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের স্বল্পতা ঢাকতে মাওলানা মৌদুদি লিখেছেন:

এক লাখ বা এর বেশী ”বলার মানে এ নয় যে, এর সঠিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সন্দেহ ছিল বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনবসতি দেখতো তাহলে সে এ ধারণাই করতো যে এ শহরের জনসংখ্যা এক লাখের বেশীই হবে, কম হবে না। **(তাফহীমুল কুর আন, সূরা আস্ সা-ফ্ ফা-ত, পৃঃ ৭৫)।**

এই প্রসঙ্গে একটি হাদিসও উল্লেখ করা যেতে পারে:

আলী ইব্‌ন হুজর (র)...উবাই ইব্‌ন কা’ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাকে (ইউনুস আ) আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম (সাফ্‌ফাত ৩৭:১৪৭) আয়াতটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেনঃ এরা ছিল (এক লক্ষ) বিশ হাজার। হাদীছটি গারীব। **(তিরমিযী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫০১, হাদীস ৩২২৯)**

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র ভুল ঢাকতে গিয়ে তাফসিরকার এবং অনুবাদক নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা বন্ধনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই ধরনের ইসলামী পরিসংখ্যান কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে—যেখানে শুধু আল্লাহ্‌ই নন, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা নবী মুহাম্মদেরও পরিসংখ্যান জ্ঞান একেবারেই মূল্যহীন বা অ-নির্ভরযোগ্য।

কোরানের একটি আয়াতে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ইসলামি নরকের আকৃতির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দিয়েছেন।

৮৯:২৩ এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ**

**ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী’ (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

এই আয়াত নিয়ে সুনান তিরমিযীতে অন্তর্গত একটি হাদিস পড়া যাক।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সেইদিন (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামকে আনা হবে। এর থাকবে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশতা। তারা এটি ধরে তা টানবে। ...আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান বলেনঃ ছাওরী (র.) হাদীছটি মারফূ’ রূপে বর্ণনা করেন নি। ...আবদ ইব্ন হুমায়দ (র।)...আলা ইব্ন খালিদ (র।) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটি মারফূ নয়। **(তিরমিযী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৫, হাদীস ২৫৭৪)**

এখন গণনা করা যাক, কতজন ফেরেশতা জাহান্নামকে টেনে আনবে—সত্তর হাজারকে সত্তর হাজার দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই (গণনাযন্ত্র বা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন) ৪.৯ বিলিয়ন বা ৪৯০ কোটি ফেরেশতা। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, উনি যা চাইবেন, তা নিমেষেই করে ফেলতে পারেন (২:১১৭)। তাই যদি হয়, তবে এই বিশাল সংখ্যক ফেরেশতার কী প্রয়োজন?

আরও একটি হাদীস দেখা যাক—হাদিসটি ইসলামি স্বর্গসুখের নমুনা।

সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)...আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেনঃ জান্নাতীদের মাঝে সর্বনিম্ন যে তারও হবে আশি হাজার সেবক, বাহাত্তর হাজার সঙ্গিনী। মোতী, যবরজদ এবং ইয়াকূত পাথরে নির্মিত পাথরে জাবিয়া থেকে সান’আ পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় (১) বিস্তৃত এক বিরাট গুম্বজ বিশিষ্ট প্রাসাদ তার জন্য

প্রতিষ্ঠা করা হবে। ...এই সনদেই নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ছোট বা বড় যে বয়সেই মারা যাক না কেন জান্নাতে গিয়ে তার বয়স হবে ত্রিশ। কখনও তাদের বয়স বাড়বে না। জাহান্নামীদের অবস্থা তদ্রূপ হবে। ...এই সনদে নবী (সা) থেকে আরো বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জান্নাতীদের যে তাজ হবে এর সবচে' নিম্নমানের মোতীটিরও ছটাও পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা কিছু সব কিছু উজ্জ্বল করে ফেলবে। ...হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইব্‌ন সা;দ (র.)-এর রেয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

পাদটিকা (১): জাবিয়া—দামিশ্‌কের একটি নগর। সানআ—ইয়ামনের একটি শহর। **(তিরমিযী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০, হাদীস ২৫৬৪)**

আমরা অনেকেই শুনেছি যে, ইসলামি স্বর্গে প্রত্যেক মুমিন বান্দা বাহাত্তরটি স্ত্রী পাবে—যাদেরকে হুরী বলা হয়। যেটা আমরা অনেকেই জানি না, সেটা হচ্ছে—প্রত্যেক মুমিনের বাহাত্তর হাজার (৭২০০০) সঙ্গিনীও থাকবে। এই সব বাহাত্তর হাজার সঙ্গিনীরাও যে যৌনসঙ্গিনী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা এদেরকে মেয়ে-বন্ধু বা ইসলামি গার্লফ্রেন্ড বলতে পারি। আর লক্ষ্য করতে হবে যে এইসব সংখ্যা হচ্ছে সর্বনিম্ন—এর চাইতে বেশি হবে, কম হবে না। আরও মনে রাখতে হবে যে এই সংখ্যা হচ্ছে সাতটি ইসলামি স্বর্গের সর্বনিম্ন স্তরের স্বর্গের সংখ্যা।

আসুন, এবার আমরা একটি হিসাব করে নেই। সংখ্যার বিশালতার জন্য সাধারণ গণনাযন্ত্রে বা ক্যালকুলেটরে এই হিসাব হয়তো না-ও করা যেতে পারে।

ধরা যাক, আজকের বিশ্বে মুমিন মুসলিমদের সংখ্যা ১.৫ বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি। সংখ্যার বিশ্বস্ততার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি, ১৫০ কোটি মুমিন সবাই সর্বনিম্ন বেহেশত (বা ইসলামি স্বর্গ) পাচ্ছেন।

যেহেতু এই ইসলামি স্বর্গের সব ফুর্তি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, সেই জন্য এই সংখ্যাকে অর্ধেক করতে হবে। অর্থাৎ ৭৫ কোটি মুসলিম পুরুষেই এই ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে।

এই সব মুমিনদের সর্বক্ষণ পরিচর্যা বা আরাম-আয়েশের নিমিত্তে আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন—

চাকর বা নফর—৮০ ০০০ গুণ ৭৫০ ০০০ ০০০—সংখ্যাটি এত বিশাল যে সাধারণ সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতে সংখ্যাটি লিখলে তা হবে এই প্রকারঃ ৬০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ যা হচ্ছে ৬০ ট্রিলিয়ন (বাংলায় কি হবে আমার জানা নেই, খুব সম্ভবত ৬০ লক্ষ কোটি)।

ইসলামি মেয়েবন্ধু বা গার্লফ্রেন্ড—৭২ ০০০ গুণ ৭৫০ ০০০ ০০০ যার ফল হচ্ছে ৫৪ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ বা ৫৪ ট্রিলিয়ন (বাংলায় খুব সম্ভবত ৫৪ লক্ষ কোটি)।

এ কী বিশাল ইসলামি ভোগসুখের কারখানা, তা আমরা কেউ চিন্তাই করতে পারি না। অন্ততপক্ষে সংখ্যার দিকে এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

আরও লক্ষণীয় ব্যাপার—ইসলামি স্বর্গে আল্লাহ তা'আলা প্রতি মুমিনের বয়স তিরিশ বছর করে দেবেন। আল্লাহ্ মনে করেন, ত্রিশ বছর বয়সে এক মুমিন পুরুষের যৌনকামনা তুঙ্গে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক মুমিন নারীদের ব্যাপারে কিছু জানাননি।

# সৃষ্টি-সংখ্যায় বিভ্রান্তি

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি-সময়ের গোলমাল নিয়ে আজকাল বেশ রচনা লেখা হয়েছে। এখানে সংক্ষিতভাবে দেখা যাক আল্লাহ কেমন করে এই বিষয়ে গণনা করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাইবেলে লেখা আছে - ঈশ্বর ছয়দিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। আরও মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অতিশয় ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

দেখা যাক, এই ব্যাপারে কোরানে কী লেখা আছে:

৭:৫৪ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের আনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী’ (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক পরিষ্কার বলেছেন, পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করতে তাঁর ছয়দিন লেগেছে। নভোমণ্ডল বলতে আল্লাহ্ কী বোঝাচ্ছেন, তা পরিষ্কার নয়। তাফসিরবিদগণ নভোমণ্ডলকে সপ্ত-আকাশই মনে করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে যে এর কোনো যোগাযোগ নেই, তা বলার দরকার নেই। কোরানের অনেক আয়াতেই আকাশকে ছাদ বলা হয়—অর্থাৎ পৃথিবীর উপরে রয়েছে সাতটি ছাদ। যেমন এই আয়াত:

৪০:৬৪ আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্ বরকতময়। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

তাই ৭:৫৪ আয়াতে ছয়দিনের সৃষ্টি বলতে পৃথিবী এবং তার উপরের সাতটি ছাদের কথাই বলা হয়েছে।

আরও অনেকগুলো আয়াতে আল্লাহ্ ছয়দিনে পৃথিবী ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির কথা বলেছেন। এই সব আয়াতগুলো হচ্ছে: ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৫০:৩৮, ৫৭:৪।

এখানে লক্ষণীয় যে, ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ বলেছেন—প্রথমে নভোমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, তার পর ভূমণ্ডল বা পৃথিবী।

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল (প্রথম) + ভূমণ্ডল (দ্বিতীয়) সৃষ্টির সময় = ৬ দিন।

আয়াত ২৫:৫৯-এ আল্লাহ্ বলছেন, তিনি প্রথমে নভোমণ্ডল, তারপর ভূমণ্ডল, তারপর এতদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় যা আছে, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।

অর্থাৎ নভোমণ্ডল (প্রথম) + ভূমণ্ডল (দ্বিতীয়) + এতদ্বয়ের মধ্যে সব কিছ সৃষ্টির সময় (তৃতীয়) = ৬ দিন।

ওপরের দুটি সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি—মহাশূন্যে যা আছে, যেমন, ছায়াপথ, নীহারিকা, অন্যান্য গ্রহ, ধুমকেতু, কৃষ্ণ গহবর...ইত্যদি তৈরি করতে আল্লাহর সময় লেগেছে = ০ (শূন্য) দিন।

তাজ্জব হবারই ব্যাপার।

এবার দেখা যাক নিচের আয়াতগুলো:

৪১:৯ বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

৪১:১০ তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন—পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

৪১:১১ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

৪১:১২ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা

দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

এই আয়াতগুলো থেকে সাধারণ জ্ঞানে আমরা যা বুঝি, তা এই প্রকার:

প্রথমে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করলেন পৃথিবী বা ভূমণ্ডল—সময় লাগলো ২ দিন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর ওপরিভাগে পর্বতমালা ও খাদ্যদ্রব্য—সময় লাগলো ৪ দিন।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করলেন নভোমণ্ডল—সময় লাগলো ২ দিন।

এখন এই সংখ্যাগুলো যোগ করা যাক, অর্থাৎ ২ + ৪ + ২ = ৮ দিন

এইসব দ্ব্যর্থক এবং বিসদৃশ আয়াতের বিব্রতকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোরানের ব্যাখাকারীরা কতই না কসরত করে যাচ্ছেন। অনেকে বলেন: কোরানের ছয় দিন সৃষ্টির অনেক কাজই যুগপৎ চলেছে—অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌ পৃথিবী বা ভূমণ্ডল সৃষ্টি করছিলেন, সেই সাথে নভোমণ্ডল বা সপ্তাকাশ নির্মাণের কাজও চলছিল। তার অর্থ দাঁড়ায়—ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করতে সর্বমোট সময় লেগেছে দুই দিন।

কিন্তু **৪১:৯-১২** পরিষ্কার বলা হচ্ছে পৃথক পৃথক সৃষ্টির কথা—পৃথিবী—তারপর পর্বতমালা ও খাদ্য দ্রব্য—তারপর আকাশমণ্ডলী।

আয়াত ২:২৯-এ আল্লাহ্‌ লিখেছেন:

২:২৯ তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সবিষয়ে অবহিত। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন বাংলা (অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

এখানে আল্লাহ তা'আলা এই সব সৃষ্টির সময় উল্লেখ করেননি।

অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রথমে ভূমণ্ডল এবং এর সাথে জড়িত সব কিছু তৈরি করলেন। তারপর তৈরি করলেন সপ্ত-আকাশ—সময় = অনির্দিষ্ট।

অবশ্য, অনেকেই বলতে পারেন যে, এই আয়াতে শুধু সৃষ্টি-সংবাদ বা তথ্যই দেয়া হয়েছে—কোনো সময় দেওয়া হয়নি।

আমরা এটাও অনুমান করে নিতে পারি, আল্লাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে এইসব তৈরি করেছেন। কারণ আল্লাহ কয়েক জায়গায় লিখেছেন যে, তিনি চাইলেই তা সাথে সাথে হয়ে যায়। যেমন:

১৯:৩৫ আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন: হও এবং তা হয়ে যায়। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রথমে ভূমণ্ডল এবং এর সাথে জড়িত সব কিছু তৈরি করলেন। তারপর তৈরি করলেন সপ্ত-আকাশ—সময় = ০ দিন।

আল্লাহ্র এই খামখেয়ালিপনার ব্যাপারে ইব্নে কাসীরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। যেমন ২:২৯ আয়াত সম্পর্কে ইব্নে কাসীর লিখেছেন:

> এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে, যে মহান আল্লাহ্ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অট্টালিকা নির্মাণের এটাই নিয়ম যে, প্রথমে নির্মাণ করা হয় নীচের অংশ এবং পরে উপরের অংশ। মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইনশাআল্লাহ এখনি আসছে। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ্ পাক অন্য স্থানে বলেছেনঃ "আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহ্ ওটা (এরূপে) নির্মাণ করেছেন যে, ওর ছাদ উঁচু করেছেন এবং ওকে সঠিকভাবে নির্মাণ করেছেন। আর ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন ওর দিনকে প্রকাশ করেছেন এরপর জমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তা হতে পানি ও তৃণ বের করেছেন এবং পর্বত সমূহ স্থাপন করেছেন। (তিনি এসব কিছু করেছেন) তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের উপকারের জন্যে।" [৭৯:২৭-৩৩]। এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি আকাশের পরে যমীন সৃষ্টি করেছেন। **[তাফসীর ইব্নে কাসীর, খণ্ড ১, ২, ৩, পৃঃ ২১৪]।**

ইব্নে কাসীর আরও লিখেছেন:

> কেউ কেউ বলেছেন যে, পরবর্তী আয়াতটিতে আসমানের সৃষ্টির পরে যমীন বিছিয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টি করা নয়। তাহলে ঠিক আছে যে,

প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন, পরে আসমান। অতঃপর যমীনকে ঠিকভাবে সাজিয়েছেন। এতে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধী আর থাকলো না। এ দোষ হতে মহান আল্লাহ্র কালাম সম্পূর্ণ মুক্ত। **[তাফসীর ইব্নে কাসীর, খণ্ড ১, ২, ৩, পৃঃ ২১৪]**।

বোঝা যাচ্ছে, ইব্নে কাসীরের সময়ও আল্লাহ্র বিভ্রান্তিমূলক আয়াত নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং ইসলামি পণ্ডিতগণ ইসলামকে রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে অর্থহীন যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন।

দেখা যাক, আল্লাহ্ কী লিখেছেন ২:১১৭-এ:

২:১১৭ তিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের উদ্ভাবক। যখন কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। **[তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]**

অর্থাৎ, প্রথমে নভোমণ্ডল, তারপর পৃথিবী বা ভূমণ্ডলের সবকিছু—সময় = ০ (শূন্য) দিন।

ইব্নে কাসীর লিখেছেন:

সেই আল্লাহ্র ক্ষমতা ও প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতো বেশী যে, তিনি যে জিনিসকে যে প্রকারের সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চান তাকে বলেন—'এভাবে হও এবং এরকম হও' আর তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন: অর্থাৎ 'যখন তিনি কোন জিনিসের (সৃষ্টি করার) ইচ্ছে করেন, তখন তাঁর রীতি

এই যে, ঐ বস্তুকে বলেন—'হও' আর তেমনই হয়ে যায়।' (৩৬:৮২) অন্য জায়গায় বলেনঃ অর্থাৎ "যখন আমি কোন বস্তু (সৃষ্টির) ইচ্ছে করি তখন আমার কথা এই যে, আমি তাকে বলি—'হও' আর তেমনই হয়ে যায়।" (১৬:৪০)অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ অর্থাৎ "চোখের উঁকি দেয়ার মত আমার একটি আদেশ মাত্র।" (৫৪:৫০) **[তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, খণ্ড ১, ২, ৩, পৃঃ ৩৭৯]।**

আল্লাহর সৃষ্টি-বিভ্রান্তি নিয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে।

'আবদুল্লাহ্ ইবন্ 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌পাক আকাশমণ্ডলী ও ভূখণ্ড সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাক্‌দীরসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। (মুসলিম, তাবারাণী ও তিরমিযী, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।)
**[মুসনাদে আহমদ: প্রথম খণ্ড: তকদির অধ্যায়, পৃঃ ১০৩, হাদীস ১]**

পঞ্চাশ হাজার বছর কে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই ১৮ ২৫০ ০০০ (১৮.২৫ মিলিয়ন) বা প্রায় ১.৮ কোটি দিন।

আর এদিকে কোরানে দেখা যাচ্ছে ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল তৈরি করতে আল্লাহ্‌র লেগেছে মাত্র ছয় অথবা আট দিন।

আধুনিক কালে পশ্চিমা দেশে অবস্থানরত কিছু ইসলামি পণ্ডিত ব্যাপারটা টের পেয়ে বলতে শুরু করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে যে সব দিন উল্লেখ, তা আসলে দিন (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার দিন) নয়। এগুলো হচ্ছে পর্ব—অর্থাৎ ছয় অথবা আট পর্ব।

তাজ্জবেরই কথা—যেখানে প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত অনুবাদক এবং তাফসিরবিদ্গণ এই সময়কে দিনই বলেছেন, সেখানে নাম না জানা কিছু ইসলামি পণ্ডিত কোরানের বিরুদ্ধেই লিখে চলেছেন!

আয়াত ১০:৩ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত তফসিরবিদ জালালাইন লিখেছেন যে, এই সময় নির্ণয় করা হয়েছে সেইভাবে, যেভাবে পৃথিবীর সময় নির্ণয় করা হয়, সেইভাবে যেহেতু তখন কোনো সূর্য বা চন্দ্র ছিল না। **[তাফসির জালালাইন ইংরাজি, আয়াত ১০:৩, অনুবাদ লেখকের]**

এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির ছয় দিন হচ্ছে, ৬ গুণ ২৪ = ১৪৪ ঘণ্টা।

আট দিন হচ্ছে ৮ গুণ ২৪ = ১৯২ ঘণ্টা।

কিসের প্রয়োজন ছিল এতদিন অপেক্ষা করে (১.৮ কোটি দিন) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার, যখন আল্লাহ্ এক নিমেষেই সবার তকদীর নির্ধারিত করে দিতে পারেন সৃষ্টির সাথে সাথে?

# ইসলামী বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেণ্ডার

প্রতি বৎসর ইসলামী বিশ্বে এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যখন দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ঈদ পালিত হচ্ছে বিভিন্ন দিনে। যেদিন সৌদি আরবে ঈদ পালিত হয়, হয়তো তার এক বা দুই দিন পরে বাংলাদেশে ঈদ পালিত হয়। অনেক সময় এই সময়ের তারতম্য দুইদিনেরও বেশি হতে পারে। রমজান বা রোজা রাখা নিয়েও এই পরিস্থিতি। আমার জানা মতে, বর্ষপঞ্জী নিয়ে ইসলাম ছাড়া এই ধরণের বিদঘুটে পরিস্থিতি অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজব্যবস্থায় নেই। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব করেনি বা করতে রাজি নয়। তার কারণ কী? আল্লাহ পাক কি এই ধরণের বিভ্রান্তি চান?

আমরা দেখব, কেন এই সমস্যা কেয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে। ইসলামী পাটিগণিত যে কেমন অনির্ভরযোগ্য, তা এই ইসলামী বর্ষপঞ্জীর হাল থেকেই বোঝা যাবে।

ইসলামী বর্ষপঞ্জী শুরু হয় খ্রিঃ ৬২২ সালে **(উইকিপিডিয়া)**। এই বর্ষপঞ্জী শুরু হয় নবী মুহাম্মদের মদিনায় হিজরির দিন থেকে। এই দিন, যথা ১৭ই জুলাই ৬২২ থেকে এই হিজরি বর্ষপঞ্জী শুরু। অর্থাৎ, ১৭ই জুলাই ৬২২ হচ্ছে ইসলামী হিজরি পহেলা (১) মুহররম হিজরি ১ সন। হিজরি বর্ষপঞ্জীতে বারোটি মাস নির্ধারিত হয়েছে: যথা—

মুহররম, সফর, রবিউল-আওয়াল, রবিউল-আখির, জামাদউল-আওয়াল, জামাদিউল-আখির, রজব, শাবান, রমজান, জ্বেল-ক্বদ, জ্বেল-হজ্ব।

ইসলামের আগমনের অনেক আগে থেকেই আরব বেদুইনরা ঠিক করেছিল যে, তারা সারা বছর রক্তপাত করবে না। তাই তারা বৎসরের চারটি মাসকে 'নিষিদ্ধ' বা পবিত্র মাস হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। এই চারটি মাস হচ্ছে—জ্বেল-ক্বদ, জ্বেল-হজ্ব, মুহররম এবং রজব। মুহাম্মদের আগমনের পূর্বে কোনো আরব গোষ্ঠী কখনই এই নিয়ম ভঙ্গ করেনি, যতই শত্রুতা থাকুক না কেন বিভিন্ন গোত্রের মাঝে। যতটুকু জানা যায়, একমাত্র নবী মুহাম্মদই একতরফাভাবে অনেক সময় এই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন—এই সব নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যুদ্ধ চালিয়েছেন এবং রক্তপাত ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ পাক নিজেই পৌত্তলিক আরবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সব সম্মানের মাসগুলিকে সম্মানের মাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

> **৯:৩৬** নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক কোরানের কোথায়ও পরিষ্কারভাবে জানাননি এই সম্মানিত মাসগুলি কোন কোন মাস।

এখন আমরা দেখব কী বিচিত্র এই ইসলামী বর্ষপঞ্জী।

ইসলামী বর্ষপঞ্জী চান্দ্র বৎসরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থা ইসলামের আগমনের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামী বর্ষপঞ্জীতে আছে ৩৫৪ অথবা ৩৫৫ দিন। এই তারতম্যের কারণ হচ্ছে—গ্রেগরিয়ান (বর্তমান ইংরাজি) বর্ষপঞ্জীর মতো ইসলামী বর্ষপঞ্জীতেও লিপ-ইয়ারের ব্যাবস্থা আছে। এই ইসলামী লিপ ইয়ার হয় প্রতি সাত বছরে এক বার।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরানে বলেছেন, ইসলামী বর্ষপঞ্জী গণনা চন্দ্রের ওপর নির্ভর করে।

> **১০:৫** তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

মনে রাখতে হবে চন্দ্রের আবর্তন চক্র (সাইকেল) হচ্ছে ২৮ দিন। সেই মতে, এক বৎসরে ইসলামী দিনের সংখ্যা হওয়া উচিত ১২ গুণ ২৮ = ৩৩৬ দিন।

এখন ৩৫৪ কে ১২ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই ২৯.৫ দিন।

৩৫৫ কে ১২ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই ২৯.৫৮ দিন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী বর্ষপঞ্জী কোনোভাবেই চন্দ্রের আবর্তন-চক্র পালন করছে না।

সেই জন্য কোনো কোনো ইসলামী মাস ধরা হয় ২৯ দিন আর কোনো কোনো ইসলামী মাস ধরা হয় ৩০ দিন—অনেকটা ইংরেজি বর্ষপঞ্জীর পদ্ধতিতে।

তাহলে অসুবিধাটা কোথায়?

লক্ষ্য করুন যে, ইংরেজি মাসগুলোতে কত দিন হবে, তা অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়েছে: যেমন, জানুয়ারি - ৩১ দিন, ফেব্রুয়ারি - ২৮ দিন (লিপ-ইয়ার ছাড়া), মার্চ - ৩১ দিন, এপ্রিল - ৩০ দিন...ইত্যাদি। এই পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্র একইভাবে পালন করা হয়। তাই যে সব আচার-অনুষ্ঠান ইংরেজি বর্ষপঞ্জীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি প্রতি বছর ঐ একই দিনে পালিত হয়, কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তাই ইংরেজি বর্ষপঞ্জী নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু ইসলামী গণনা পদ্ধতি এমন নয়। ইসলামী মাসের গণনা শুরু হয় চাঁদ দেখা গেল বা দেখা গেল না এর ওপর। ইসলামী দিন গণনা শুরু হয় সন্ধ্যায়, চাঁদ দেখার পর। যদি মাসের ২৯ দিনে সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ দেখা যায়, তবে ঐ মাস হবে ২৯ দিন, আর যদি না দেখা যায়, তবে ঐ মাসটি হবে ৩০ দিন। এই জন্যই কোনো কোনো বছর ২৯টি রোজা হয় আর কোনো কোনো বছর রোজা হয় ৩০ টি, আবার কোনো কোনো বছর ২৮ দিনও। এমনও হয় যে, কোনো বছর দুইবার রমজানের শুরু হয় এবং ঈদও হয় দুইবার। আমাদের জীবদ্দশাতেই হয়তো অনেকেই তা পর্যবেক্ষণ করেছি। লক্ষ্য করবেন যে, এক সময় রমজান পালিত হচ্ছে হাড় কাঁপানো শীতকালে, আবার এক সময় রমজান পালিত হচ্ছে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমের সময়। আর যখন এক ইসলামী দেশে ঈদ বা রমজান শুরু হয়, অন্য আর এক (এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশেও) দেশে তা হয় না।

ইসলামী বর্ষপঞ্জীর আরও অনেক দ্ব্যর্থকতা বা অস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় এই কয়েকটি আয়াতে:

> **২৯:১৪** আমি নূহ (আঃ)—কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী।

> **১৮:২৫** তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ’ বছর অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে।

তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ্ পাক সরাসরি নির্ভুলভাবে বলতে পারেন না কত সময় লেগেছিল—তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এই অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখন চিন্তা করুন চিকিৎসা ক্ষেত্রে অথবা গাড়ি বা বাড়ি কিনবার সময় যদি এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়, তবে তার পরিণতি কী হতে পারে।

এইসব বিভ্রান্তিমূলক গণনা কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা আল্লাহ্ তা’আলা জানাননি। এই বিড়ম্বনা এড়াতে আজকাল অনেক ইসলামী পণ্ডিত বলেন—বৎসরগুলি চন্দ্র এবং সৌর গণনার ওপর। কী বিচিত্র যুক্তি! কিন্তু রূপান্তরিত গণনা করলেও আমরা এই দুই সংখ্যা এক পাব না। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আয়াত ২৯:১৪ দেখুন:

আমরা আগেই দেখেছি, এক সৌর বছরে আছে ৩৬৫ দিন আর এক চন্দ্র বছরে আছে ৩৫৪ দিন (লিপ ইয়ার বাদে)। মনে রাখতে হবে এক দিনের সময় মাপ একই হতে হবে অর্থাৎ এক দিন = ২৪ ঘণ্টা তা সৌর বছরই হোক বা চন্দ্র বছরই হোক।

এখন গণনা করা যাক:

চন্দ্র বছরে ১০০০ বছর গুণ ৩৫৪ = ৩৫৪ ০০০ দিন

সৌর বছরে ৯৫০ বছর গুণ ৩৬৫ = ৩৪৬ ৭৫০ দিন

এই দুই হিসাবের তারতম্য হচ্ছে ৩৫৪ ০০০ বিয়োগ ৩৪৬ ৭৫০ = ৭ ২৫০ দিন

এই তফাতকে সৌর বছরে রূপান্তরিত করা যাক—৭ ২৫০ ভাগ ৩৬৫ = ১৯.৯ বছর বা ১৯ বছর ৩২৯ দিন।

তাহলে ইসলামী পণ্ডিতদের যুক্তির সার্থকতা কোথায়?

এখন আয়াত ১৮:২৫ যে সময়ের কথা আল্লাহ্ পাক বলেছেন, তার গণনা করুন ওপরের উদাহরণের মত। দেখুন, কি ফলাফল।

# নামায এবং পাপের গণনা

প্রতিদিন (২৪ ঘণ্টায়) পাঁচবার নামায পড়া ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে এক অন্যতম স্তম্ভ। নিয়মিত সঠিকভাবে নামায না পড়া শুধুমাত্র পাপই নয়, অনেক ইসলামী স্বর্গ, যেমন ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইত্যাদি দেশগুলোতে এ এক দণ্ডনীয় অপরাধ। নবী নিজেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা রীতিমত নামায আদায় করে না, উনি তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে চান। এখানে একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই ধরনের অনেক হাদিস আছে।

> **ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬১, হাদীস ৬২৪।** উমর ইব্‌নে হাফ্‌স (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী (সা.) বলেছেনঃ মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু’ সালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন), আমি সংকল্প করে ছিলাম যে মুআয্‌যিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে এরপরও যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

এক মুমিন তার জীবিতকালে ন্যূনতম কতবার নামায আদায় করবেন, তার একটু হিসাব করা যাক।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী, নামায শিক্ষা শুরু হয় একজন শিশু যখন সাত বছর বয়সী হয়। আর দশ বছরে উপনীত হলে নামায ফরজ বা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। নিয়মিত নামায না পড়লে দশ বছর থেকে মারধোরও করা যেতে পারে। ধরা যাক, এক মুমিনের আয়ুষ্কাল পঁচাশি (৮৫) বছর। অর্থাৎ পঁচাশি বছর পর্যন্ত একাধারে দৈনিক পাঁচবার তাকে নামায আদায় করতে হবে।

সুতরাং জীবিত থাকাকালীন নামায আদায়ের সময় হবে ৮৫-১০ = ৭৫ বছর। এক বছরে ৩৬৫ দিন হিসাবে ধরা যাক।

সর্বমোট নামায আদায় করতে হবে ৭৫ গুণ ৫ গুণ ৩৬৫ = ১৩৬ ৮৭৫ বার বা ১ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত পঁচাত্তর বার।

এই হিসাব ধরা হয়েছে—শুধুমাত্র ঘরে, একাকী নামায আদায়ের ওপর।

এই হিসাবে প্রতি শুক্রবার অর্থাৎ জুমার নামায ও অত্যধিক নফল নামায বাদ দেওয়া হয়েছে।

এক বছরে ৫২ জুমা নামায হবে।

তাহলে সারা জীবনে জুমার নামাজ পড়তে হবে ৭৫ গুণ ৫২ = ৩ ৯০০ বার। এই সংখ্যাটি ওপরে নির্ণীত সংখ্যার সাথে যোগ করা যেতে পারে। জুমার নামায

বাধ্যতামূলক—এবং এই নামায গৃহে পড়া যাবে না। জুমার নামায মসজিদে পড়া বাধ্যতামূলক।

কিন্তু, হাদিস পড়ে বোঝা যায়, এক মুমিনকে এত বার নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই।

> **ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, হাদীস ৬১৭।** আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের সাতাশ' গুন বেশী।

এখন ওপরে হিসাবকৃত ১৩৬ ৮৭৫ কে ২৭ দিয়ে ভাগ করলে প্রায় ৫ ০৬৯ বার নামায হয়।

এই ৫ ০৬৯ বার কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ১০১৩.৮ দিন।

১০১৩.৮ দিনকে ৩৬৫ দিয়া ভাগ করলে পাওয়া যায় প্রায় ২.৮ বছর বা দুই বছর নয় মাসের মতো।

এর এর অর্থ হচ্ছে: একজন মুমিন প্রতিদিন ধরে ২ বছর ৯ মাস তার নিকটস্থ মসজিদে যাতায়াত করে পাঁচটি বাধ্যতামূলক নামায আদায় করলেই তার জীবনের সব নামায আদায় হয়ে যাবে। এরপর তার আর নামায পড়ার দরকার নেই; শুধুমাত্র শুক্রবারের জুমার নামায পড়া ছাড়া। অর্থাৎ, তেরো বছরে উপনীত হবার পূর্বেই তা'র নামাযের পালা শেষ হয়ে যাবে। অন্তত ওপরের হাদিস অনুযায়ী গণনা করলে তাইই পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপারই বটে!

অন্য এক হাদিসে ২৭ গুণের স্থলে ২৫ গুণ বলা হয়েছে, যেমন উক্ত হাদিস বই-এর ৬১৮ নম্বর হাদীস।

এখন আরও একটি হাদিস পড়া যাক:

> **ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮ হাদীস ৬১৮।** মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সওয়াব, তার নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয় (১)। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্‌তাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন—"হে আল্লাহ্! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বঅলে গণ্য হয়।
>
> পাদটীকা (১): এ হাদীসে শুধু পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি হওয়াই বলা হয়নি, বরং দ্বিগুণ করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নিচের হাদিসটি পড়া যাক:

**ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭, হাদীস ১১১৭**। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)...আবূ হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।

ধরা যাক, এক মুমিন মদিনায় গিয়ে এক মাস (৩০ দিন) থাকলো এবং প্রতিদিন নবীর মসজিদে গিয়ে পাঁচ নামায আদায় করল।

এর পুরস্কার হবে ১০০০ গুণ ৫ গুণ ৩০ = ১৫০ ০০০।

এখন সেই মুমিন যদি ওপরে দেখানো হিসাব মত মসজিদে নামাজ আদায় করে থাকে, অর্থাৎ মদিনায় যাবার আগে, তা'হলে মদিনা থেকে ফেরার পর তার নামায বাকি থাকে--

১৩৬ ৮৭৫ বিয়োগ ১৫০ ০০০ = -১৩ ১২৫

এই সংখ্যাটি বিয়োগাত্মক (নিগেটিভ) হয়েছে এই কারণে যে, ঐ মুমিনের সারা জীবনে যে সালাতের প্রয়োজন ছিল তা'র চাইতেও অনেক বেশি সালাত সে আদায় করে ফেলেছে তিরিশ দিন মদীনায় নবীর মসজিদে সালাত আদায় করে।

তা'হলে কোনো মুমিন কাবা শরীফে এক নামায আদায় করলে কত পুণ্য পাবে? অনেকদিন আগে আমি 'আলিম' সফটওয়্যার কিনেছিলাম। সেই সফটওয়্যার এখন আমার নতুন কম্পুটারে চলে না। আগ্রহী পাঠকেরা 'আলীম' সফট্‌ওয়্যার কিনে অথবা ডাউন-লোড করে নিচের অনুবাদকৃত হাদিসের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন।

**Transmitted by Ibn Majah. (Al-Tirmidhi, Number 247- taken from the Alim CD-ROM Version**

Narrated Anas ibn Malik Allah's Messenger (peace be upon him) said: The prayer of a person in his house is a single prayer; his prayer in the mosque of his tribe has the reward of twenty-five prayers; his prayers in the mosque in which the Friday prayer is observed has the reward of five hundred; **his prayer IN THE MOSQUE OF AQSA (i.e. BAYT AL-MAQDIS) has a reward of fifty thousand prayers; his prayer in MY MOSQUE (the Prophet's mosque in Medina) has a reward of fifty thousand prayers; and the prayer in the Sacred Mosque (Ka'bah) at Makkah has a reward of one hundred thousand prayers.**

বাংলা অনুবাদ হচ্ছে:

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: এক ব্যক্তি তার নিজস্ব গৃহে নামায আদায় করলে তার মর্তবা হবে এক। সে যদি তার গোত্রের মসজিদে নামায পড়ে তার মর্তবা হবে পঁচিশটি নামাযের সমান। সে জুমার মসজিদে নামায আদায় করলে তার মর্তবা পাবে পাঁচশত গুণ। আল-আকসা মসজিদে এক নামায পড়ার মর্তবা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আমার মসজিদে এক নামায পড়লে তার মর্তবা হবে হবে পঞ্চাশ

হাযার নামাযের সমান। আর কাবার মসজিদে এক নামাযের মর্তবা হবে এক লক্ষ নামাযের সমান।

এখন পাপের হিসাব করা যাক। একজন মুমিন তার জীবদ্দশায় কত পাপ করবে, তার সঠিক হিসাব কেউ জানে না। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রত্যেকদিন সে বারোটি পাপ করে। চিন্তা করা যায় যে, সে দৈনিক পাপ করছে এইভাবে:

দুই হাতে দুই পাপ

দুই পায়ে দুই পাপ

দুই চোখে দুই পাপ

দুই কর্ণে দুই পাপ

এক মুখে এক পাপ

এক জিহবায় এক পাপ

এক লিঙ্গে (স্ত্রী অথবা পুরুষ) এক পাপ

এক নাসিকায় এক পাপ

সর্বমোট বারো পাপ। অবশ্যই এই পাপের তালিকায় অনেক কিছুই বাদ পড়েছে—মস্তিষ্কের পাপ (কুচিন্তা), আঙ্গুলের পাপ, যৌনতার পাপ (বিভিন্ন প্রকার)—এই সব আর কি।

তাই জীবিত অবস্থায় (দশ থেকে পঁচাশি বছর পর্যন্ত) তার পাপের সংখ্যা হবে ১২ গুণ ৭৫ গুণ ৩৬৫ = ৩২৮ ৫০০০ টি (৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০)।

এই বিশাল পাপ থেকে মুক্তির উপায় কী?

অনেক পাপই অযুর সাথে মুছে ফেলা হয়। যেমন, দুই হাত ধৌতের সময় দুই পাপ ধৌত হয়ে যায়...এই রকম ভাবে একবার অযু করলে ন্যূনতম বারোটি পাপ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেন। অযু শেষে আবার নতুন করে পাপ করা চলবে, এই চক্র চলবে দিন রাত সব সময়ই।

কিন্তু এই বারো পাপের চাইতেও অসংখ্য পাপ এক মুমিন দৈনিক করে থাকে। এই সব অগুনতি পাপ থেকে মুক্তির কী উপায়?

এর এক সহজ উত্তর হচ্ছে সালাত।

দেখুন এই হাদিস:

> **সহীহ মুসলিম, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার ঢাকা, খণ্ড ২, পৃঃ ৩২২, হাদীস ১২৪০।** আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে তেত্রিশবার আল্লাহ্র তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহ্র তাহমীদ বা প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবীর বা আল্লাহ্র মহত্ব বর্ণনা করবে আর এইভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে—“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি আিইয়েন কাদীর” অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও লা-শারীক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম—তার গোনাহ্সমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও মাফ দেওয়া হয়।

এই হাদিসে পরিষ্কার হয় না—সারা জীবনের পাপ নাকি এক দিন বা তদীয় অংশের পাপ। যদি সারা জীবনের পাপ হয়ে থাকে তবে পাপমোচনের এর চাইতে ভাল পন্থা আর কী হতে পারে? আর যদি দৈনিক পাপের জন্য হয়ে থাকে—তবে গণনা করে নিন কয়বার এই পন্থা নিতে হবে জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

এর চাইতেও ভালো পন্থা আছে: ওপরে উদ্ধৃত বুখারী শরীফ হাদিস ৬১৮-তে।

> এই হাদিসে বলা হয়েছে:
>
> '...সে যখন উত্তমরূপে উযূ করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়'।

ওপরের হিসাব অনুযায়ী, মসজিদের উদ্দেশে ২৩৭ ৭৫০ বার কদম ফেললেই আল্লাহ্ পাক সব পাপ মাফ করে দেবেন।

ইসলামী পাপ থেকে মুক্তি পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হবে হজ্জ পালন। একবার হজ্জ পালন করলেই জীবনের সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়ে যাবে—প্রতিটি হাজি হয়ে যাবে নবজাত শিশু। কিন্তু এই হজ্ব হতে হবে হজ্বের মৌসুমে—অন্য সময় নয়, অর্থাৎ উমরা করলে সমস্ত পাপমোচন হবে না—হয়ত বা আংশিক হতে পারে।

> **ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭০, হাদীস ১৪৩১।** আদম (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্ব করলো

এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহুর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

আরও একটি হাদিস দেখা যাক:

> **এহিয়াও উলুমিদ্দীন, বাংলা অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান,দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭।** হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, সে প্রত্যেক হরফের বদলে একশ'টি সওয়াব পায়। যে নামাযে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে সে প্রত্যেক হরফের বদলে পঞ্চাশটি সওয়াব পায় এবং যে ওযু ছাড়া পাঠ করে সে দশটি নেকী পায়। রাতের বেলায় নামাযে দাঁড়িয়ে পড়া সর্বোত্তম। কেননা, রাতের বেলায় মন খুব একাগ্র থাকে।

উইকিপিডিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে জানা গেল যে, কোরানে ৩৩০ ১১৩টি হরফ আছে; হরফ বলতে এখানে আরবি হরফই বলা হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—কারণ কোরানের অনুবাদ, সে যে ভাষায়ই হউক না কেন, তা' নাকি কোরান নয়—এটা সব ইসলামী পণ্ডিতদের অভিমত।

দেখা যাক, একবার কোরান তেলাওয়াত সম্পন্ন করলে কতটুকু সওয়াব বা পুণ্য পাওয়া যাবে। ধরা যাক, সে নামাযে বসে সম্পূর্ণ কোরান তেলাওয়াত করল। আর যদি সে আংশিক কোরান তেলাওয়াত করে, তবে নিচের হিসাবটি সংশোধন করে নিতে হবে।

৫০ গুণ ৩৩০ ১১৩ =১৬ ৫০৫ ৬৫০ (ষোল মিলিয়নেরও বেশী)

অনেকেই বলে থাকেন, একজন সাচ্চা মুমিনের উচিত হবে মাসে একবার কোরান তেলায়াত করা। তাহলে বছরে বারো বার, এবং তার জীবদ্দশায় হবে এই প্রকার—

**১৬ ৫০৫ ৬৫০ গুণ ১২ গুণ ৭৫ = ১৪ ৮৫৫ ০৮৫ ০০০ (প্রায় ১৫ বিলিয়ন বা ১৫০০ কোটি)**

এই অবিশ্বাস্য নেকী পাওয়া কল্পনারও বাইরে। এর অর্থ হচ্ছে, এক মুমিন যত পাপই করুক না কেন, নামায, কোরান তেলাওয়াত দ্বারা সমস্ত পাপের থেকে সে মুক্তি পাবেই। আর সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে, শুধু একবার হজ্ব করলেই সমস্ত পাপ আল্লাহ্ পাক ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবেন।

এই হিসেব থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, কেন সমস্ত ইসলামী বিশ্ব পাপ এবং দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

শেষ প্রশ্ন হতে পারে—নবী করীম কি কোনো পাপ করেছেন কিংবা এখনও করে চলেছেন?
আমরা কোরানে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সবচাইতে প্রিয় নবী অনেক পাপ করেছেন। দেখুন:

> **৪০:৫৫** অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

> **৪৭:১৯** যেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

নবী সারা জীবনে সম্ভাব্য কত পাপ করেছেন, তার একটা ধারণা নিচের হাদিসে পাওয়া যায়।

> **ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বুখারী শরীফ, নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩, হাদীস ৫৮৬৮।** আবুল ইয়ামান (র)...আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি প্রত্যহ সত্তরবারেরও বেশী ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি।

উপরের হাদিস থেকে অনুমান করা যেতে পারে রাসূলুল্লাহ দৈনিক গড়পড়তা সত্তরটি পাপ করতেন। এখন সহজেই আমরা হিসাব করে নিতে পারি তাঁর জীবদ্দশায় কী পরিমাণ পাপ করেছিলেন।

কিন্তু আল্লাহ্ অতিশয় চালাক। তাই নিম্নের আয়াতে আল্লাহ্ পাক নবীর সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন। অতীতের পাপ বলতে কী বোঝায়, তা বোধগম্য। কিন্তু ভবিষ্যতের পাপ বলতে আল্লাহ্ পাক কী বলেছেন, তা পরিষ্কার নয়। এমন হতে পারে যে, ভবিষ্যতের পাপ বলতে নবীর মরণোত্তর পাপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যুর পরে ইসলামী স্বর্গে গিয়েও নবী পাপ করছেন—এখনও। কিন্তু আল্লাহ্ সেই সব পাপ মাফ করে দেবেন।

**৪৮:১** নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট

**৪৮:২** যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতে ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

অন্যান্য যে সব আয়াতে নবীর পাপের বর্ণনা আছে সেগুলো হচ্ছে: ৯৪:২ এবং ৯৪:৩।

আর একটা সুখবর হচ্ছে—নাস্তিক এবং ইসলাম-বিদ্বেষীরা যারা অনেকবার কোরান আবৃত্তি করেছে, তারাও যে তাদের পাপ থেকে হয়ত ছাড়া পেয়ে যাবে, তা ওপরের হিসাব থেকে প্রতীয়মান হয়। তাই নাস্তিক, ইসলামফোব, ইসলাম ঘৃণাকারী, হারামখোর, হারামজাদা...এদের উচিত হবে আরও বেশি বেশি কোরান পড়া।

# আল্লাহ্‌র সুদ কষা

**[দ্রষ্টব্য: এই রচনায় উদ্ধৃত কোরানের অধিকাংশ আয়াত নেওয়া হয়েছে তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী’ (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান হতে]**

ইসলামে সুদ গ্রহণ করা এবং সুদ দেওয়া অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। সুদের কারবারের নিষিদ্ধতা নিয়ে কোরানে অনেক আয়াত আছে, যেমন:

**২:২৭৫** যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে তারা বলেছে: ক্রয় বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ্ তাআলা ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

ওপরের আয়াতে আল্লাহ্ সুদখোর মহাজনদের নরকে পাঠাবার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌নে কাসিরের বর্ণনায়:

**তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪৭**। মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতকগুলো লোককে দেখেন যে, তাদের পেট বড় বড় ঘরের মত। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এই লোক গুলো কে?' বলা হয় এর সুদখোর।'

সহীহ বুখারীর একটা হাদীস উল্লেখ করে ইব্‌নে কাসীর আরও লিখেছেন: **তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪৭**। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের পেট সর্পে পরিপূর্ণ ছিল যা বাহির হতে দেখা যাচ্ছিল। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে সুদীর্ঘ নিদ্রার হাদীসে হযরত সুমরা' বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, কয়েকটি লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন ফেরেশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাদের মুখ ফেড়ে এক একটি পাথর ভরে দিচ্ছেন। তারপর সে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তারা সুদখোরের দল। তাদের এই শাস্তির কারণ এই যে, তারা বলতো সুদ ব্যবসায়ের মতই। তাদের এই প্রতিবাদ ছিল শরীয়তের উপর এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপর। তারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের মত হালাল মনে করতো।

[আগ্রহী পাঠকেরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বুখারী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪২৭, হাদীস ১৩০৩ পড়ে নিতে পারেন।]

এখানে সুদের পরিণামের আরও কয়েকটি ভয়াবহ ইসলামী চিত্র দেওয়া হল:

**বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেশন, সুনানু ইবনে মাজাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, হাদীস ২২৭৩।** আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ মিরাজের রাতে আমি এমন এক কাওমের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল ঘরের মত, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে যাচ্ছিল আমি জিজ্ঞাসা করি, জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বলেনঃ এরা সূদখোর।

**বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেশন, সুনানু ইবনে মাজাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, হাদীস ২২৭৪।** 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)...আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সূদ হলো সত্তর প্রকারের পাপের সমষ্টি। তার সবচেয়ে সহজটি হলো আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।

এতদসত্ত্বেও নবীর যুগের আরবেরা লোভনীয় সুদের ব্যবসা ছাড়েনি। নবীর অনেক নিকটাত্মীয় সুদের কারবার করতেন। এঁদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবীর চাচা আল-আব্বাস। তাই আল্লাহ্ নামিয়ে দিলেন এই আয়াত:

**২:২৭৬** আল্লাহ্ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

ইব্নে কাসিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতের প্রসঙ্গ হচ্ছে:

**তাফসীর ইব্নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৫২।** আল্লাহ তা'আলা বলেন যে তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বরকত নষ্ট করে থাকেন। দুনিয়াতেও ওটা ধবংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়।

লক্ষণীয় যে, যদিও আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তবুও আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আল্লাহর নামে দান-খয়রাত করবে, আল্লাহ্ তাকে বর্ধিত ধন-সম্পদ দেবেন। এটা সুদের পর্যায়ে পড়ে কি না, আমরা পরে আলোচনা করব।

**২:২৭৮** হে ঈমানদারগন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

**২:২৭৯** অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মুলধন পেয়ে যাবে তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।

ওপরের দু’টি আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুমিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যারা সুদখোর, তারা যেন স্বেচ্ছায় তাদের কাছে প্রাপ্য সুদ পরিহার করে নেয়। অর্থাৎ, সে সব সুদখোর মহাজনেরা শুধুমাত্র মূলধন ফেরত পাবে—সুদ পাবে না।

এর পরেও আরবের সুদখোরেরা তাদের সুদের ব্যবসা ছাড়তে গড়িমসি করতে থাকে। তখন আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে ঐসব টাকার লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের আদেশ তিনি তাঁর নবীকে দিয়ে দেন।

এই আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ হচ্ছে:

**তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৫**। সাকীফ গোত্রের বানু আমর বিন উমায়ের ও বানু মাখযুম গোত্রের বানু মুগীরার সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞতার যুগে তাদের মধ্যে সুদের কারবার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর বানু আমর

বানু মুগীরার নিকট সুদ চাইতে থাকে। তারা বলেঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমরা তা দিতে পারি না। অবশেষে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। মক্কার প্রতিনিধি হযরত আত্তাব বিন উসায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্বন্ধে পত্র লিখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবা করতঃ তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জেনে নেয়া সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবে—'তোমরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' তিনি বলেনঃ 'যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তাঁর জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে তাওবা করাবেন। যদি তারা তাওবা না করে তবে তিনি তাদেরকে হত্যা করাবেন।' হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও হযরত ইবনে সীরীনেরও (রঃ) এটাই উক্তি।

কী ভয়ানক কথা এখানে লেখা হয়েছে। চিন্তা করুন—বাংলাদেশে পাকা ইসলামী শাসন কায়েম হলে কী হতে পারে।

ওপরের আয়াতগুলিতে যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সাধারণ বা সরল সুদ, অর্থাৎ যে সুদের হার ও পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। তার মানে এই সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায় না। আল্লাহ যখন জানলেন যে, সুদ চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়তে পারে, তখন নামিয়ে দিলেন এই আয়াত:

**৩:১৩০** হে ঈমানদারগণ। তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।

আল্লাহ যখন জানলেন যে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইহুদিরা চক্রবৃদ্ধি সুদের কারবার করত, তখন তাদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করলেন।

**৪:১৬১** আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

এখন দেখা যাক ইসলামী সুদ বলতে কী বোঝায়। এই ব্যাপারে আমি এখন পর্যন্ত পরিষ্কার কোন বক্তব্য দেখিনি—না কোরানে, না অগুণতি হাদিসে। কোরানের কোথাও সুদের যথোচিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শুধু সুদকে হারাম এবং যারা সুদের ব্যবসা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজার কথা লেখা হয়েছে। সুদের হিসাব কীভাবে করা হয়, তার কোনো আভাসই দেওয়া হয়নি কোরানে। তবে ওপরে উদ্ধৃত কোরানের এক আয়াত (৩:১৩০) থেকে ধারণা করা যায় যে, আধুনিক কালের মতই তখনও চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রচলন ছিল। অনুমান করা যেতে পারে, এই চক্রবৃদ্ধি সুদ কেমন করে হিসাব করা হয়, সে বিষয়েও আরবের সুদের ব্যবসায়ীরা জানতো।

এখানে ইসলামী সুদ কাকে বলা হয় সে ব্যাপারে কিছু হাদিস দেওয়া হল—

**বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেশন, বুখারী শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২১, হাদীস ১৯৫০।**

আবূ নুআঈম (র.)...আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত

খেজুর দেওয়া হত, আমরা দু’সা’ এক সা’—এর বিনিময়ে বিক্রি করতাম। নবী (সা.) বললেন, এক সা’ এর পরিবর্তে দু’সা’ এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু’দিরহাম বিক্রি করবে না।

**বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেশন, বুখারী শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪, হাদীস ২০৩৯।**
আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)...মালিক ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার এক দীনারের বিনিময় সার্ফ (১) এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সার্ফ করতে রাযী হলেন এবং আমার থেকে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্জী গাবা (নামক স্থানে) হতে না আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে উমর (র.) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! তার জিনিষ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় রিবা (সূদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় রিবা হবে।

পাদটীকা (১): স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়কে সার্ফ বলে।

**ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আবু দাউদ শরীফ, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫৫, হাদীস ৩৩১৫।** ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা...’উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা সূদের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু যদি তা হাতে-

হাতে লেনদেন হয়; গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করাও সূদ, তবে যদি তা হাতে-হাতে হয়; খেজুরের বিনিময়ে খজুর বিক্রি করাও সুদ, কিন্তু যখন তা হাতে-হাতে হবে, এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করাও সূদ তবে যখন তা হাতে-হাতে হবে, তখন সূদ হবে না। (১)

পাদটীকা (১): একই ধরণের জিনিস হলে এর একটির বিনিময়ে অন্যটি ধার নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় 'রেবা' বা সূদের অন্তর্ভূক্ত। জিনিস একই ধরণের হলে তা নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত, অর্থাৎ একটি জিনিস নিয়ে ঐ ধরণের অন্য জিনিস তৎখণাৎ আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কেউ সেই জিনিসের মূল্য দিতে চায়, তবে তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে (অনুবাদক)

এই সব হাদিসে যে পরস্পরবিররোধী এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামী সুদের ব্যাপার যে জটিল, তার স্বীকারোক্তি হযরত উমরের বিবৃতিতে পাওয়া যায়: ইবনে কাসীর লিখেছেন:

**তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪৯**। ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলোকে শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন এক রকম এবং কেউ বলেছেন অন্য রকম। বাস্তব কথা এই যে, এটা একটা জটিল বিষয়। এমনকি হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় পূর্ণভাবে আমার বোধগম্য হয়নি। বিষয় তিনটি হচ্ছেঃ দাদার উত্তরাধিকার, পিতা-পুত্রহীনদের উত্তরাধিকার এবং সুদের অবস্থাগুলো...

ওপরের হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, নবী মোহাম্মদ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত কিছু পণ্যের লেনদেনকে, যেখানে পণ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তাকেই সুদ বা রিবা অভিহিত করেছেন। এই ব্যবস্থা যে মোটেই আধুনিক যুগের সুদের পর্যায়ে পড়ে না, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই ধরণের পণ্য লেনদেনের (বার্টার) ব্যবসায়কে রিবা বা সুদ ঘোষণা করে তা নিষিদ্ধ করলে যে আজকালকার ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়বে, তা মুহাম্মদের পরবর্তী অনেক ইসলামী পণ্ডিত বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা সুবিধামত সুদ বা রিবার সংজ্ঞা দিয়ে চলেছেন। আজও এই বিভ্রান্তির সমাপ্তি ঘটেনি। অনেক ইসলামী দেশেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর সুদকে লাভ বা মুনাফা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর সুদের একটা ইসলামী সংজ্ঞা পাওয়া গেল:

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা দ্রব্যই হ'ল রিবা। ইমাম আবুবকর আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলী যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।

**প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ৬।** প্রখাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর বলেন, 'জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হ'ল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা'। আরবরা তাই-ই করত এবং নির্দিষ্ট

মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত।

এই দুই ইসলামী মনীষীর সুদ বা রিবার সংজ্ঞা কোরআন এবং হাদিসে উল্লেখিত সুদের সাথে সম্পূর্ণ খাপ খায় না।

ওপরে উদ্ধৃত কোরানের আয়াত এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী এবং আল্লাহ তৎকালীন আরবদেশে বিরাজমান সুদের প্রথাকে এক মহা লাভ এবং লোভের ব্যবসা হিসেবে মনে করতেন এবং সেই জন্য সুদ বা রিবার ওপর আল্লাহ এবং তাঁর নবীর ছিল এত ঘৃণা এবং আক্রোশ, অনেক ক্ষেত্রে ঈর্ষাও বলা যায়।

এই জন্য কেউই আশা করতে পারে না যে, কোনোক্রমেই আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মদ সুদের কারবার করবেন।

তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে—আল্লাহ্ নিজেও এই লোভনীয় সুদের ব্যবসা চালিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! সুদের বা বর্ধিত সম্পদের লোভ দেখিয়েই নবী এবং আল্লাহ চাইছেন সমগ্র পৃথিবীবাসীকে ইসলামে ঢোকাতে।

দেখা যাক কোরানের কিছু আয়াত:

**২:২৪৫** এমন কে আছ যে আল্লাহ্‌কে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্‌ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

এই আয়াতে আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের নিকট কর্জ বা ঋণ চাচ্ছেন। এই ঋণের অর্থ জিহাদের পথে, ইসলামী রক্তপাতের পথে, মৌলভি-মাওলানার পকেটে, মসজিদ, মক্তব মাদ্রাসার পথে খরচ করা হবে। এই সবের পিছনে কোনো মুমিন যদি আল্লাহকে এক টাকা ঋণ দেয় তবে আল্লাহ তাকে নূন্যতম দুই টাকা ফেরত দেবেন।

এখানে সুদের হার হচ্ছে নূন্যতম শতকরা একশত বা ১০০%। আহা! কী লোভনীয় সুদই না আল্লাহ দিচ্ছেন!

আল্লাহর লোভনীয় সুদের আকর্ষণে অনেকেই যে মুক্ত হস্তে আল্লাহ্‌কে ঋণ দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেছেন:

**তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৫।** অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর পথে খরচ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। এরূপ উৎসাহ তিনি স্থানে স্থানে দিয়েছেন। হাদীস-ই-নযুলেও রয়েছেঃ ‘কে এমন আছে যে, সেই আল্লাহ্‌কে ঋণ প্রদান করবে যিনি না দরিদ্র, না অত্যাচারী?’...(২:২৪৫) এই আয়াতটি শুনে হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ আনসারী (রাঃ) বলেছিলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ‘আল্লাহ্‌ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন?’ তিনি বলেন ‘হাঁ’। হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ্‌ তখন বললেনঃ ‘আমাকে আপনার হাত খানা দিন।’ অতঃপর তিনি তাঁর হাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত নিয়ে বলেনঃ ‘আমি আমার ছয়শো খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সম্মানিত প্রভুকে ঋণ প্রদান করলাম।’ সেখান হতে সরাসরি তিনি বাগানে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ডাক দেনঃ ‘হে উম্মুদ্‌দাহ্‌দাহ্‌!’ স্ত্রী উত্তরে বলেনঃ আমি উপস্থিত রয়েছি।’ তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ ‘তুমি বেরিয়ে এসো। আমি এই বাগানটি আমার মহা সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দিয়েছি (তাফসির-ই-ইবনে আবি হাতীম)।’ ‘করয-ই-হাসানা’-এর ভাবার্থ আল্লাহ তা’আলার

পথেও খরচ হবে, সন্তানদের জন্যেও খরচ হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতাও বর্ণনা করা হবে।

**৬৪:১৭** যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋন দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ সুদ দেবেন শতকরা একশত হারে (এক বৎসরে)। এখানে কোনো সময়ের উল্লেখ করা হয়নি। যদি ধরা যায় এক নিমেষ অথবা এক সেকেন্ড, তবে সুদের হার হবে অকল্পনীয়। কারও সাধ্যি আছে এই সুদের আকর্ষণ পরিহার করা!

**২:২৬১** যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌নে কাসীর মুসনাদে আহ্‌মাদের এই হাদিস থেকে লিখেছেন:

**তাফসীর ইব্‌নে কাসীর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৬-৭২৭।** ... মুসনাদে-ই-আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী দান করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'লোকটি কিয়ামতের দিন সাত কোটি লাগাম বিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রাপ্ত হবে।'

এখানে আল্লাহ্‌র সুদের হার অকল্পনীয়। দেড় বিলিয়ন মুসলিম (১.৫ বিলিয়ন বা ১৫০ কোটি) প্রত্যেকে যদি একটি করে উষ্ট্রী বা সমমূল্যের অর্থ আল্লাহকে ঋণ দেয়, তবে

প্রত্যেকে যে-পরিমাণ সুদ পাবে, তা মনে হয় গণনা যন্ত্র বা ক্যালকুলেটরে হিসাব করা যাবে না; শক্তিশালী কম্পিউটার লাগবে এর জন্য।

একটা উষ্ট্রীর দাম যদি ৩০০ মার্কিন ডলার ধরা হয়, তবে প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ সুদসহ ফেরত দেবেন ৭০ ০০০ ০০০ গুণ ৩০০। এর ফলাফল হচ্ছে ২১০ বিলিয়ন ডলার। কে এই লোভ সম্বরণ করতে পারে?

তবে আল্লাহ্ এবং নবী মুহাম্মদ অত বোকা নন। তাই এই অকল্পনীয় অর্থের মালিক হতে হলে বান্দাকে মারা যেতে হবে, সম্ভব হলে জিহাদের ময়দানে রক্তপাত করে।

এখন হিসাব করুন ১.৫ বিলিয়ন মুসলিমের জন্য কত মার্কিন ডলার আল্লাহ দেবেন।

এই ধরনের আরও অনেক আয়াত কোরানে আছে। আগ্রহী পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন: ২:২৬২, ৫:১২, ৩০:৩৯, ৫৭:১১, ৫৭:১৮, ৬৪:১৭,

নবী মুহাম্মদও কি সুদের কারবার করেছিলেন? নিচের হাদীস দুটি দেখুন। ইসলামী সুদের সংজ্ঞার বিবেচনায় এইসব লেনদেন তো সুদই হওয়া উচিত।

**ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তিরমিযী শরীফ, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৫২০, হাদীস ১২৪২।** কুতায়বা (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি দাস নবী (সা)-এর কাছে তাঁর হিজরতের উপর বায়আত হয়। সে যে একজন দাস এই কথা নবী (সা) বুঝতে পারেন নি। অনন্তর এই দাসটির মালিক এসে এটিকে নিয়ে যেতে চাইল। তখন নবী (সা) তাকে বলেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। অনন্তর তিনি এটিকে দুজন কাল গোলামের বিনিময়ে কিনে নেন। এরপর থেকে আর তিনি, গোলাম কি—না, এই কথা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়আত করতেন না।
এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি

হাসান-সাহীহ।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, দস্ত বদস্ত (নগদ) হলে দুজন দাসের বিনিময়ে একজন দাস ক্রয়ে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু বাকীতে হলে তাদের মতবিরোধ রয়েছে।

**ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আবু দাউদ শরীফ, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫৯, হাদীস ৩৩২৪।** হাফ্‌স ইব্‌ন ‘উমার (র.)...’আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যোদ্ধা-বাহিনী তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় উট শেষ হয়ে গেলে তিনি তাকে সাদাকার উট আসার শর্তে উট গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। তখন তিনি দু’টি উট প্রদানের শর্তে সৈন্যদের জন্য একটি উট গ্রহণ করতে থাকেন।

এই দুই হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী মুহাম্মদের সুদের হার ছিল শতকরা একশত ভাগ বা ১০০%।

সুদের ব্যাপারে নবী মুহাম্মদের শেষ মন্তব্য দেখা যায় এই হাদিসে;

**ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আবু দাউদ শরীফ, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৩৪৮, হাদীস ৩২৯৮।** মুহাম্মদ ইব্‌ন (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ-ই সূদ খাওয়া ছাড়া থাকবে না। আর যদিও কেউ সূদ না খায়, তবে সে এর প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

ইব্‌ন ‘ঈসা বলেনঃ (যদি কেউ সূদ নাও খায়) তবু সে সূদের ধুলা ময়লা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (১)

পাদটীকা (১). বর্তমান যুগের ব্যবসা, বাণিজ্য, লেন-দেন, কাজ-কার-বার এমনকি দেশের অর্থনৈতিক উন্নত ও অগ্রগতির জন্য যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তা সূদভিত্তিক। এই ঋণের সাহায্যে দেশে যে শিল্প, কল-কার-খানা গড়ে তোলা হয় এবং সেখানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সবই সূদের সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিতে বর্তমানে কেউ-ই সূদের প্রভাব মুক্ত নয়। (অনুবাদক)

বোঝা যাচ্ছে, সুদের হিসাব এতই লোভনীয় যে, আজ সমগ্র ইসলামী জগতও সুদের লোভে মাতোয়ারা, যদিও এটাকে সুদ আখ্যায়িত না করে লাভ বা মুনাফা বলা হয়।

# কোরানের ভগ্নাংশ

**[দ্রষ্টব্যঃ এই রচনায় উদ্ধৃত কোরানের অধিকাংশ আয়াত নেওয়া হয়েছে তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান হতে]**

কোরানে কতগুলি আয়াত আছে, কেউ কি কোনোদিন গণনা করে দেখেছেন? মজার বিষয় যে এই তুচ্ছ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। কোরানের আয়াত সংখ্যা সম্পর্কে **উইকিপিডিয়া** খুঁজে এই তথ্য পাওয়া গেল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)—৬৬১৬ আয়াত

নাফি (রাঃ)—৬২১৭ আয়াত

শায়বা (রা)—৬২১৪ আয়াত

মিশরের ইসলামি পণ্ডিত—৬২২৬ আয়াত

রাশাদ খালীফা—৬৩৪৬

এদিকে যামাখশারি, বদিউযযামান এঁদের মতে কোরানের আয়াত সংখ্যা—৬৬৬৬

এখন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আয়াত সংখ্যার মাঝে তফাত হচ্ছে ৬৬৬৬ বিয়োগ ৬২১৪ = ৪৫২ আয়াত।

অদ্ভুত ব্যাপার—একই কোরানে এত প্যাচাল।

কোরানে শব্দের সংখা নিয়েও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এক হিসাবে বলা হয়েছে ৯৯ ৪৬৪ শব্দ, আর এক তথ্যে দেখা যায় ৭৭ ৪৩০ শব্দ **(উইকি)**। এখানে শব্দের তারতম্য হচ্ছে—

৯৯ ৪৬৪ বিয়োগ ৭৭ ৪৩০ = ২১ ৬৩৪ শব্দ

এইসব বিশাল তারতম্যের কারণ কী হতে পারে, তার কোনো সঠিক কারণ কোথায়ও পাওয়া যায় না। নানা আজে বাজে কারণ বলার পর বলা হয় যে, সব সংখ্যাই নাকি সত্য এবং সব সংখ্যাই গ্রহণীয়। একে পাগলের যুক্তি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? সেই শৈশব থেকে আমরা শুনে এসেছি যে, কোরান সর্বকালে, সর্বস্থানে কিয়ামত পর্যন্ত একই প্রকার। তা-ই যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করেতেই হবে যে, কোরানে যতগুলি আয়াত (বা শব্দ বা হরফ) আছে, তা একই হতে হবে - যেখানেই এবং যখনই হোক। কিন্তু এই তারতম্য দেখে মনে হয়, এই ধারণা সত্যি নয়। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন স্থানে কোরানের আয়াতের সংখ্যা বিভিন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা এড়ানোর জন্য আজকাল ইসলামি পণ্ডিতেরা কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ ধরে নেন। কিসের ভিত্তিতে এই সংখ্যা নির্ণিত হয়েছে, তার কোনো সদুত্তর আমি কোথায়ও দেখিনি। অথবা কোন কোরানের ভিত্তিতে এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে তার উত্তরও আমি পাইনি। মনে হচ্ছে এই সংখ্যা (৬২৩৬) একটা আপোস।

এই অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি এড়াবার জন্য আমি মাওলানা মৌদুদির এবং মাওলানা ইউসুফ আলীর কোরানের আয়াতের সংখ্যা গণনা করলাম। দু'টি থেকেই আমি একই

উত্তর পেলাম—তা হচ্ছে, আজকে যে-কোরান মুসলিমদের মাঝে আছে, তার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে ৬২৩৯। ইসলামি পণ্ডিতদের আপোসকৃত ৬২৩৬ আয়াতের সাথে আমার গণনার তফাত হচ্ছে ৩ আয়াত। আমি কোনোক্রমেই বুঝলাম না, কেন এমন হল। বারবার গণনা করলাম—কিন্তু প্রতিবারেই একই উত্তর পাই, অর্থাৎ ৬২৩৯। পাঠকেরা আমার গণনায় ভুল থাকলে জানিয়ে দেবেন, আমি সংশোধন করে নেব।

যাই হোক, এই পর্বের জন্য আমি ইসলামি পণ্ডিতদের সংখ্যাই ব্যবহার করব। অর্থাৎ ধরে নেব, কোরানের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে ৬২৩৬।

তার মানে কোরান রপ্ত করতে হলে এই ৬২৩৬ আয়াত রপ্ত করতে হবে। কোরান মুখস্থ করতে হলে এই ৬২৩৬ আয়াত মুখস্থ করতে হবে।

আজব ব্যাপার হচ্ছে যে, নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী কোরান আবৃত্তির জন্য এত পরিশ্রম করার দরকার নেই। অনেক হাদিসে দেখা যায় যে, কোনো কোনো সূরার ফজিলত (স্বীকৃতি বা সম্মান) এত বেশি যে, এই সূরাগুলি পড়লেই সমগ্র কোরান পড়া সমাধা হতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

অনেক হাদিসে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ১১২, সূরা এখলাছ)-কে কোরানের এক তৃতীয়াংশের সমান ধরা হয়েছে।

> **ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তিরমিযী শরীফ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬০, হাদীস ২৮৯৯।** আব্বাস ইবন মুহাম্মদ দূরী (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি কূরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

**বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, সহীহ মুসলিম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, হাদীস ১৭৬৩।** আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম? সবাই জিজ্ঞেস করলেন, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বো? তিনি বললেনঃ 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

অর্থাৎ, সূরা এখলাছ (সূরা ১১২) গুণ ৩ (তিনবার আবৃত্তি) = ১/৩ গুণ ৩ = ১ বা গোটা কোরান আবৃত্তি।

ইসলামি পুণ্য পাবার জন্য একমাসে নূন্যতম একবার গোটা কোরান আবৃত্তির পরামর্শ দেওয়া হয়।

নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী এক দিনে কোনো মুমিন তিনবার সূরা এখলাছ আবৃত্তি করলেই এক মাসের কোরান আবৃত্তি হয়ে যবে। অন্য কোনো সূরা পড়ার দরকার নেই। কী মজার ব্যাপার—এ কি বিশ্বাসযোগ্য? এই আবৃত্তি যে একসময়ে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো সময়ে পৃথক পৃথকভাবে আবৃত্তি করলেও চলবে—যেমন ভোরবেলা, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রে শোবার আগে।

এখানে সূরা এখলাছ (সূরা ১১২) সম্পর্কিত আরও একটি চিত্তাকর্ষক হাদিস দেওয়া হল।

**বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, সহীহ মুসলিম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, হাদীস ১৭৬৫।** আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সবাইকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ তোমরা এক জায়গায় জমায়েত হও। কারণ আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শোনাব। সুতরাং যাদের জমায়েত হওয়ার তারা জমায়েত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি পড়লেন। তারপর তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে থাকলাম, আমার মনে হয় আসমান থেকে কোন খবর এসেছে আর সে জন্যই তিনি ভিতরে প্রবেশ করেছেন। পরে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেরিয়ে এসে বললেনঃ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। জেনে রেখো এটি (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরা) কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।

এখানে নবী করীম নিজেই উদাহরণ দিলেন যে, সূরা ইখলাছ (সূরা ১১২) একবার পাঠ করলেই কোরানের এক-তৃতীয়াংশ কোরান পাঠ হয়ে যাবে। নবীর এই উদাহরণের পরে আর কোনো যুক্তি-তর্ক চলতে পারে কি?।

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তিরমিযী শরীফ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, হাদীস ২৮৯৩।** মুহাম্মদ ইব্ন মূসা জুরাশী বাসরী (র)...আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ ইযা যুল যিলাত সূরা যে ব্যক্তি পাঠ করবে অর্ধেক কুরআনের সমান তার সওয়াব হবে। কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন যে পাঠ করবে তার জন্য কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠের সমান সোয়াব হবে। যে ব্যক্তি কুল হওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে তার কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে।

হাদীছটি গারীব। হাসান ইবনুল সালম (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এখন হিসাব করা যাক—

সূরা ৯৯ (সূরা যিলযাল) = ১/২ কোরান
সূরা ১০৯ (সূরা কাফিরূন) = ১/৪ কোরান
সূরা ১১২ (সূরা এখলাছ) = ১/৩ কোরান

এই ভগ্নাংশগুলি যোগ করা যাক ১/২ + ১/৪ + ১/৩ = ১৩/১২ = ১.০৮

দেখা যাচ্ছে, এই তিনটি সূরা পাঠ করলেই শুধু সমগ্র কোরান নয়, তার চাইতেই বেশি কোরান পড়া হয়ে যাবে।

সময়ের হিসাবে—এই তিন সূরা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।

অর্থাৎ, কেউ যদি দৈনিক পাঁচ মিনিটে (বিশেষত ফজরের নামাযের অল্প একটু আগে) এই তিনটি সূরা আবৃত্তি করে নেয়, তাহলে সে গোটা কোরান বা তার চাইতে বেশি পড়ে নিল ধরে নিতে হবে।

কোরানে ১১৪ টি সূরা আছে। ওপরের হিসাবের মানে - ঐ তিনটি সূরা পড়ে নিলে বাকি ১১১টা সূরা পড়ার দরকার নেই।

এই ধরণের আরও একটি হাদিস দেখা যাক: এই হাদিসে সামর্থহীন মুমিনদের বিবাহে মাহ্‌রে (দেন-মোহর বা যৌতুক) কোরানের ব্যবহার বর্ণনা করা হয়েছে।

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তিরমিযী শরীফ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-২৫৮হাদীস ২৮৯৫।** উকবা ইব্‌ন মুকাররাম আম্মী বাসরী (র)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক সাহাবীকে বললেনঃ হে অমুক, তুমি কি বিয়ে করেছ? লোকটি বললঃ না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে বিয়ে করার মত কিছু নেই।

তিনি বললেন তোমার সাথে কি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ।

তিনি বললেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার সঙ্গে কি ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্‌ সূরাটি নেই?

লোকটি বলল, হ্যাঁ

তিনি বললেনঃ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সুরাটি নেই?

লোকটি বললঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেনঃ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি ইযা যুল যিলাতিল আরদু সূরাটি নেই?

লোকটি বললঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। বিয়ে করে নাও বিয়ে করে নাও। হাদীছটি হাসান।

এখন হিসাব করা যাক।

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা এখলাছ, সূরা ১১২) = ১/৩  কোরান
ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্ (সূরা নছর, সূরা ১১০) = ১/৪ কোরান
কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন (সূরা কাফেরূন, সূরা ১০৯) = ১/৪
ইযা যুল যিলাতিল আরদু (সূরা যিলযাল, সূরা ৯৯) =১/৪ কোরান
এই ভগ্নাংশগুলির যোগফল ১/৩ + ১/৪ + ১/৪+ ১/৪ = ১৩/১২ = ১.০৮ কোরান

বোঝা গেল, কোনো নারীকে বিবাহে যৌতুকের টাকা দেবার সামর্থ্য না থাকলে কোরানের ভগ্নাংশ আবৃত্তি করলেই চলবে।

চমৎকার ব্যবস্থা, নিঃসন্দেহে।

লক্ষ্যণীয় যে, এই হাদিসে নবী করীম সূরা যিলযাল (সূরা ৯৯)-কে কোরানের এক-চতুর্থাংশ ধরেছেন, অথচ এর আগের একটা হাদিসে নবীজি সূরা যিলযাল-কে কোরানের অর্ধেক ধরেছেন।

এখন সূরা যিলযালকে (সূরা ৯৯) কোরানের অর্ধেক ধরে নিয়ে ওপরের ভগ্নাংশগুলি যোগ করলে আমরা পাব:

১/৩ + ১/৪ +১/৪ + ১/২ = ১৬/১২ =৪/৩ = ১.৩৩

অর্থাৎ, যৌতুক হিসেবে কোরানের বেশি দেওয়া হবে—৪/৩ – ১ = ১/৩ বা এক-তৃতীয়াংশ বেশী দেওয়া হবে।

তাজ্জবের ব্যাপার—মনে হয় আল্লাহ (পড়ুন নবী) কেমন করে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করতে হয়, তা জানেন না।

এখন দেখা যাক নিম্নের হাদিসটি

> **ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তিরমিযী শরীফ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩-২৫৪, হাদীস ২৮৮৭।** কুতায়বা ও সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ প্রতিটি বস্তুরই অন্তর আছে। কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন [সূরা ৩৬]। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার এ পাঠের বিনিময়ে দশ কুরআন পাঠ সমতূল্য ছওয়াব নির্ধারণ করবেন।
>
> এ হাদীছটি হাসান-গারীব। হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র।)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আর এ সূত্র ছাড়া বাসরায় কাতাদা (র.)...এর রিওয়ায়ত সম্পর্কে কিছু জানা নেই।
>
> আবূ মূসা মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)...হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান থেকে উক্ত সনদে তা বর্ণিত আছে।
>
> এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তটি সনদের দিক থেকে সাহীহ নয়। এর সনদ যঈফ।

এই হাদিসে নবী বলেছেন সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে দশ কোরান পাঠের সমতূল্য পুণ্য পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন (সূরা ৩৬) ১বার পাঠ = ১০বার কোরান পাঠ

তাজ্জবের ব্যাপারই বটে। কেননা, ইসলামি পাটিগণিতের এই ধারণা যে ভগ্নাংশ-তত্ত্বের ভিত্তিই ধবংস করে দিচ্ছে! অর্থাৎ ভগ্নাংশ কখনই সমস্তের সমান হতে পারে না—এই তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করছে।

তাই কেউ যদি একশত বার সূরা ইয়াসীন (সূরা ৩৬) আবৃত্তি করে, তবে ধরে নিতে হবে সে এক হাজার বার কোরান আবৃত্তি করেছে!

# ইসলামিক উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব

**[দ্রষ্টব্যঃ এই রচনায় উদ্ধৃত কোরানের অধিকাংশ আয়াত নেওয়া হয়েছে তফসীর মাআরেফুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান হতে।]**

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সমস্ত ইসলামিক দেশগুলোতে উত্তরাধিকার আইন ইসলামসম্মত কায়দা-কানুনে তৈরি। আমরা অনেকেই জানি যে, এই আইন অনুযায়ী এক নারীর প্রাপ্য এক পুরুষের অর্ধেক। বলা হয় যে, এই আইন নাকি আল্লাহ পাক দিয়েছেন—স্বর্গ হতে। অর্থাৎ কোরানের বিধান অনুযায়ী। তাহলে আমরা প্রত্যাশা করি যে, কোরানে লিখিত আল্লাহ্‌র আইন একেবারে নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ। আল্লার হিসাবে কোনো গরমিল থাকা অসম্ভব। এখন দেখা যাক, আল্লাহ্‌র যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগের দৌড় কতটুকু।

প্রথমেই আমরা কোরান থেকে পড়ে নিই কয়েকটি আয়াত, যেখানে আল্লাহ্ পাক উত্তরাধিকার আইন দিয়েছেন।

৪:১১ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের

পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারীস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

৪:১২ আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়, ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থেকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, ক্ষতি না করে, এ বিধান আল্লাহ্র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৪:১৭৬ তারা তোমার নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করছে, তুমি বলঃ আল্লাহ তোমাদের পিতা-পুত্রহীন (ব্যক্তির অর্থ বণ্টন সম্বন্ধে ফতোয়া দান করেছেন, যদি কোন

ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান ন থাকে তবে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি দুভগ্নি থাকে তবে তাদের উভয়ের জন্যে পরিত্যাক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা-ভগ্নি পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দু'নারীর তুল্য অংশ পাবে, আল্লাহ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। **[দ্রষ্টব্যঃ মারেফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদে এই আয়াতের অনুবাদ দূর্বোধ্য মনে হয়েছে আমার। তাই আমি বাংলা তাফসীর কুর'আনুল কারীম; অনুবাদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ব্যাবহার করেছি। প্রকাশকঃ দারুস সালাম, রিয়াদ সৌদি আরব, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭।]**

মূলতঃ এই তিনটি আয়াতের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

একজন পুরুষ মারা গেল। উত্তরাধিকারি হিসেবে সে রেখে গেল এক স্ত্রী, কয়েক কন্যা, মাতা এবং পিতা। এখন ওপরে উদ্ধৃত আয়াত অনুযায়ী সম্পত্তির বণ্টন হবে এই রকম:

স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, অর্থাৎ ১/৮ = ৩/২৪ (আয়াত ৪: ১২)

কন্যারা (দুই অথবা ততোধিক) পাবে দুই তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ২/৩ = ১৬/ ২৪ (আয়াত ৪:১১, ৪:১৭৬)

পিতা পাবেন এক-ষষ্টমাংশ, অর্থাৎ ১/৬ = ৪/২৪ (আয়াত ৪:১১)

মাতা পাবেন এক-ষষ্টমাংশ, অর্থাৎ ১/৬ – ৪/২৪ (আয়াত ৪:১১)

এই ভগ্নাংশগুলো যোগ করলে আমরা পাই ৩/২৪ + ১৬/২৪ + ৪/২৪ + ৪/২৪ ২৭/২৪ = ১.১২৫

দেখা যাচ্ছে, এই যোগফল একের চাইতে বেশি হচ্ছে। অর্থাৎ বণ্টন সম্পত্তি মূল সম্পত্তির চাইতে বেশি। এটা ভগ্নাংশ যোগের মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করছে।

আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। এই উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ পাক নিজেই নিজের আইন ভঙ্গ করেছেন। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক (অথবা পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুন)। সেইমতে মাতা পাবেন পিতার অর্ধেক—অর্থাৎ ১/১২। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ পাক পিতা এবং মাতা উভয়কেই একই পরিমাণ দিচ্ছেন

আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক:

এক ব্যক্তি মারা গেল। উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেল, এক ভগিনী এবং এক ভাই। এরা পাবে—

ভগিনী পাবে অর্ধেক, অর্থাৎ ১/২ (আয়াত ৪:১১)
ভ্রাতা পাবে সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ১ (পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১) (আয়াত ৪:১১)

এই সংখ্যা দুটি যোগ করলে আমরা পাব ৩/২ অথবা ১.৫

দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি ভণ্টনের পর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি হয়ে গেছে।

তাজ্জবের ব্যাপারই বটে।

দেখুন নিচের উদাহরণগুলো:

এক বিবাহিত নারী মারা গেল সন্তানহীন অবস্থায়। তার ছিল স্বামী, দুই ভগিনী এবং ভ্রাতা। এই নারীর  উত্তরাধিকারী হচ্ছে নিম্নরূপ:

স্বামী পাবে অর্ধেক বা ১/২ (আয়াত ৪:১২)
ভগিনীরা পাবে ১/৩ (আয়াত ৪:১৭৬)
ভ্রাতারা পাবে ভগিনীর দ্বিগুন অর্থাৎ ২/৩ (আয়াত ৪:১১)

যোগ করলে আমরা পাই ১/২ + ১/৩ + ২/৩ = ৭/৬ = ১.১৭

কী আশ্চর্যের ব্যাপার।

এক সন্তানহীন নারী মারা গেল। রেখে গেল স্বামী, ভগিনী এবং মাতা।

এই নারীর সম্পত্তি বণ্টন হবে

স্বামী পাবে অর্ধেক, অর্থাৎ ১/২ = ৩/৬ (আয়াৎ ৪:১২)
ভগিনী পাবে অর্ধেক, অর্থাৎ ১/২ – ৩/৬ (আয়াত ৪:১১)
মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১/৩ -২/৬ (আয়াত ৪:১১)

এই ভগ্নাংশগুলো যোগ করলে আমরা পাই ৩/৬ + ৩/৬ + ২/৬ = ৮/৬ = ১.৩৩

কেমন করে সম্পত্তি বন্টন হবে?

এক ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেল। রেখে গেল এক স্ত্রী, মাতা,এবং  ভগিনী। ইসলামী আইন অনুযায়ী তার সম্পত্তির বণ্টন হবে নিম্নরূপে:

স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ১/৪ = ৩/১২ (আয়াত ৪:১২)
মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১/৩ = ৪/১২ (আয়াত ৪:১২)
ভগিনীরা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ২/৩ = ৮/১২ (৪:১৭৬)

এই সকল ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে ৩/১২ + ৪/১২ + ৮/১২ = ১৫/১২ = ১.২৫

আশ্চর্য হবারই কথা।

এক বিবাহিত নারী মারা গেল। তার উত্তরাধিকারী থাকল:

ভগিনীরা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ বা ২/৩ (আয়াত ৪:১৭৬)
ভ্রাতারা পাবে (ভগিনীর দ্বিগুণ) ৪/৩ (আয়াত ৪:১৭৬)

এই ভগ্নাংশের যোগফল হবে ২/৩ + ৪/৩ = ৬/৩ = ২

দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি বণ্টনের পর ইসলামী আইন অনুযায়ী সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। ভেল্কীবাজিই বটে।

তবে এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ৪:১৭৬ আয়াতে এই পরিস্থিতিতে বোন এবং ভাই-এর অংশ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছুই উল্লেখ করা হয়নি—শুধু বলা হয়েছে 'পুরুষ দু'নারীর তুল্য অংশ পাবে।'

এই সব উদাহরণ থেকে আল্লাহর পাটিগণিতের জ্ঞান দেখে তাজ্জব না হয়ে পারা যায় না। এই আল্লাহ্‌র পাটিগণিত আমাদের স্কুল, কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি ব্যবহার করা হয়, তার পরিণতি কী হবে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এখন একটা ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া যাক।

এক ব্যক্তি মারা গেল। রেখে গেল ২৭ ০০০ ডলার। এখন তার উত্তরাধিকারীরা কী পরিমাণ পাবে, তা ইসলামী নীতি অনুযায়ী হবে:

স্ত্রী ১/৮ (আয়াত ৪:১২) = ১/৮ গুণ ২৭ ০০০ = ৩ ৩৭৫

মাতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুণ ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০

পিতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুণ ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০

দুই কন্যা ২/৩ (আয়াত ৪:১১, ৪;১৭৬) = ২/৩ গুণ ২৭ ০০০ = ১৮ ০০০

এই সংখ্যাগুলোর যোগফল হচ্ছে ৩০ ৩৭৫ ডলার।

দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি বণ্টন করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক ৩০ ৩৭৫ বিয়োগ ২৭ ০০০ = ৩ ৩৭৫ অতিরিক্ত ডলার সৃষ্টি করে ফেলেছেন।

আরও বিচিত্র ব্যাপার আছে। আগেই লেখা হয়েছিল যে, কোরানে আল্লাহ্ পাক নিজেই নিজের আইন ভঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ—এই আইন আল্লাহ্ পাক অনেক স্থানেই পালন করেননি। সেইমত হলে ওপরের ডলারের হিসাব হবে নিম্ন প্রকার:

স্ত্রী ১/৮ (আয়াত ৪:১২) = ১/৮ গুণ ২৭ ০০০ = ৩ ৩৭৫

মাতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুণ ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০

পিতা ২/৬ (পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ) = ২/৬ গুণ ২৭ ০০০ = ৯ ০০০

দুই কন্যা ২/৩ (আয়াত ৪:১১, ৪;১৭৬) = ২/৩ গুণ ২৭ ০০০ = ১৮ ০০০

এখন যোগ করলে ফলাফল দাঁড়ায় ৪৩ ৮৭৫ ডলার।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ভেল্কীবাজি দিয়ে (৪৩ ৮৭৫ বিয়োগ ২৭ ০০০) ১৬ ৮৭৫ ডলার বানিয়ে দিলেন।

এই সব উদাহরণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ পাক ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ জানেন না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে নিরক্ষর নবী এবং তাঁর অধিকাংশ অশিক্ষিত, অমার্জিত, অসভ্য বেদুইন সাঙ্গপাঙ্গরা ভগ্নাংশের কিছুই জানত না। তাই যেভাবে খুশি সংখ্যা বলে গেছে, কিন্তু নবীর জীবদ্দশায় তা যাচাই করে দেখেনি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই আধুনিক যুগে ইসলামী দেশসমূহে এই বিচিত্র ইসলামী উত্তরাধিকার আইন কেমন করে চালানো হচ্ছে? এর উত্তরও ইসলামিস্টরা করে দিয়েছে — আরও বিচিত্রভাবে। এই সব ছলচাতুরী হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়। তাদের এই প্রক্রিয়া যে অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে, তা তাদেরকে কে বোঝাবে? আগ্রহী পাঠকেরা যে কোনো ইসলামী সাইটে গিয়ে ইসলামিস্টদের এই ছলাকলা দেখে নিতে পারেন। এই অদ্ভুত হিসাবব্যবস্থা শত শত বৎসর যাবত উপমহাদেশের নির্দোষ সাধারণ মুসলিমদের পারিবারিক আইন হিসেবে তাদের গলায় ঝুলছে। এই অযৌক্তিক নিয়ম থেকে পরিত্রাণের কোনো আশু সম্ভাবনাই নেই। তাফসীর পড়ে আরও অবাক হতে হয়। আল্লাহ্ পাকের (নবী মুহাম্মদ পড়ুন) পাটিগণিতের দৌড়ের বিব্রতকর অবস্থা রক্ষা করতে এই সব তাফসিরকাররা নিজের মনগড়া ভাষ্য দিয়ে গেছেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোরানের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে আগ্রহী পাঠক ইবনে কাসীরের তাফসির পড়তে পারেন।

# আল্লাহ্‌র ব্যাপ্তিকালের হিসাব

আল্লাহ্‌র সময়ের হিসাব করেন কীভাবে? আমরা হয়ত মনে করি, আল্লাহ্‌র সময়ের হিসাবে আমাদের পার্থিব হিসাবের মতই। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। দেখা যাক আল্লাহ্ পাক কী লিখেছেন আয়াত ২২:৪৭-এ:

২২:৪৭ তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান

এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন

আল্লাহ্‌র ১ দিন = মানুষের ১ ০০০ বছর।

তার অর্থ আল্লাহ্‌র ২৪ ঘণ্টা = মানুষের ১ ০০০ বছর

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ১ ঘণ্টা = মানুষের ১ ০০০/২৪ = ৪১.৭ বছর

এভাবে হিসাব করলে আমরা পাই

আল্লাহ্‌র ১ মিনিট = মানুষের ০.৭ বছর বা ২৫৬ দিন

আল্লাহ্‌র ১ সেকেণ্ড = মানুষের ০.০১১ বছর বা ৪ দিন

৩২:৫ তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যাঁর পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।

৭০:৪ ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তাআলার দিকে ঊর্ধগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

## উপসংহার

এই প্রবন্ধে দেখা যায়, আল্লাহ্ পাক পাটিগণিতের অনেক মৌলিক নিয়ম জানেন না। যেমন পরিসংখ্যান তত্ত্ব, সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিতেও আল্লাহ পাক পারদর্শী নন। তারপর আছে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি। বিশাল সংখ্যা লেখার জন্য সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ সংখ্যাকে দশ-এর সুচক বা ১০ এর ঘাত দিয়ে লেখা হয়। উদাহরণ হচ্ছে—বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন...ইত্যাদি, যদিও আল্লাহ্রই সৃষ্ট মানবকূল এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে—যুগ যুগ ধরে। সবকিছুই যদি আল্লাহ্র ইচ্ছাতে হয়, তা'হলে এটা কেমন করে সম্ভব যে, যা মানুষ জানে—তা আল্লাহ্ পাক তা জানেন না?

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েও আল্লাহ্ মহাবিভ্রান্তিতে আছেন। তাঁর সৃষ্টিরহস্যের যে সমীকরণ, তারও তিনি সমাধান কেমন করে করতে হয়, তা জানেন না। তারপর তাঁরই সৃষ্ট বর্ষপঞ্জী নিয়ে তিনি মহাবিব্রত—যার কুফল আজও সমগ্র ইসলামী জগৎ পাচ্ছে—অর্থাৎ ইসলামী আচার অনুষ্ঠান, রোজা, হজ্জ্ব, ঈদ—এই সব একক দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এই ব্যাপারটা মাছের বাজারের মত হয়ে গেছে—যার যা ইচ্ছে, সেই মতো ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে, যা অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে। তাই বলতেই হয় যে ইসলামী বর্ষপঞ্জী আধুনিক যুগে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

এটা স্বীকার্য যে, আধুনিক দশমিক পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ, সরলকরণ ইত্যাদি বুনিয়াদী পাটিগণিতের নিয়ম সহজ নয়। এই সব দক্ষতা অর্জনের জন্যই বিদ্যার্থীরা অনেক বছর অতিবাহিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপরেও অনেকেই রয়ে যায় অপারদর্শী। সেইজন্যেই বিশ্বের সর্বত্রই মৌলিক পাটিগণিত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পাঠ করতে হয় অতি অল্প বয়সেই। আমরা অবাক হয়ে দেখি যে, আল্লাহ্ পাকও এই বিদ্যায় অজ্ঞ। পাটিগণিতে আল্লাহ্র দৌড় ধরা পড়ে শতকরা হিসাবে এবং ভগ্নাংশের হিসাবে। এই সব গণনার জন্য দরকার উৎপাদক, ল সা গু, গ সা গু ইত্যাদির জ্ঞান। বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ পাক তাও জানেন না।

আল্লাহ্ পাক কোরানে (৭:১৫৮, ২৯:৪৮) লিখেছেন যে, তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি নবী করীম ছিলেন নিরক্ষর। নিরক্ষরের অর্থ যে অশিক্ষিত, তা নয়। তবে নবী যে পাটিগণিতের কোনো নিয়ম জানতেন না, তা পরিষ্কার। এছাড়াও তাঁর বেশিরভাগ সাহাবীও (সাঙ্গ-পাঙ্গরা) ছিলেন নিরক্ষর ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবর্জিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আল্লাহ পাকও নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। কিন্তু ইসলাম বলে, আল্লাহ্ পাক সবজান্তা, সর্বশক্তিমান। তাই যদি সত্যি হয়, তবে স্বীকার করতেই হয় যে, কোরান আল্লাহ্র লিখিত কিতাব নয়। কোরান নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদেরই লেখা।

**সমাপ্ত**

## সূত্র:

আজকাল ইসলামের বেশির ভাগ মৌলিক গ্রন্থ্ বিভিন্ন ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে পারেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com/

http://www.quranhadith.org/quran.html

http://islameralo.wordpress.com/

http://islamiboi.wordpress.com/

Alim CD ROM

Jalalu'd-Din Al-Mahali and Jalal'ud-Din As-Suyuti. *Tafsir Al-Jalalyn*, translated in English by Aisha Bewley. Dar Al-Taqwa Ltd. 7A Melcombe Street, Baker Street, London NW1 6AE, 2007. ISBN: 1-870582-61-6
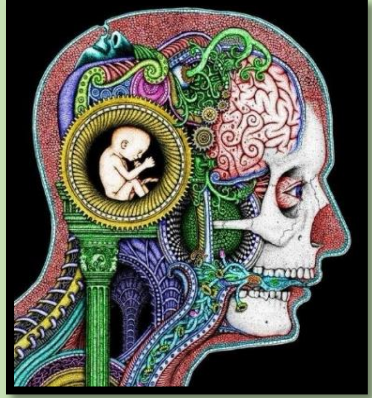
ইসলামী পণ্ডিতেরা এবং ইসলামী ঐতিহাসিকেরা সর্বদাই প্রচার করে চলেছেন যে, বিশ্বকে অঙ্কশাস্ত্র বিশেষত বীজগণিত উপহার দিয়েছে ইসলাম।

এই ইবুকটিতে উদাহরণ সহ দেখানো হয়েছে, ইসলামের উৎস, তথা কোরান এবং হাদিসগুলোতে কীভাবে পাটিগণিতের ব্যবহার করা হয়েছে।

**'ইসলামি পাটিগণিত'** লিখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও কিংবদন্তিতুল্য ইছলাম-গবেষক এবং কোরান, হাদিস ও ইছলামের ইতিহাস সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী **আবুল কাশেম**।

**একটি ধর্মকারী ইবুক**

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net